ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৫ তম বর্ষ ■ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ■ পদ্মনাভ ৫৩৫ ■ অক্টোবর ২০২১

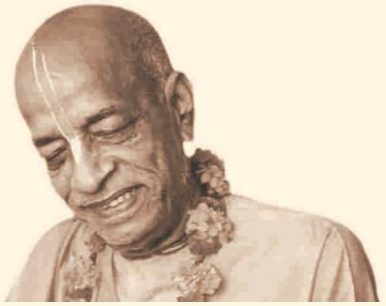

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

একটি সুস্থ সমাজ গঠন

আমরা বলি না যে প্রত্যেকে খাদ্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে একটি বিভাগ খাদ্য উৎপাদন করবে, একটি বিভাগ মানুষকে আধ্যাত্মিক দিগদর্শন করাবে এবং একটি বিভাগ রাজা বা সরকার রূপে সমস্ত কিছু পরিচালনা করবে।

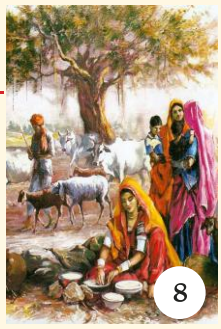

৬ আচার্য বাণী

গুরু নির্দেশ পালনই সফলতার চাবিকাঠি

শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি-বিধানের মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। এমনকি কেউ যদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা সত্ত্বেও গুরুদেবের প্রীতি-বিধান করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে পারমার্থিক জীবনে ব্যর্থ হবে এবং এইভাবে সে জীবনের পরম লক্ষ্যে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

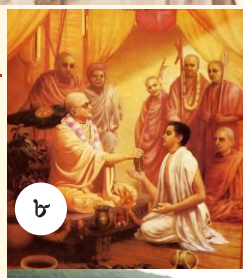

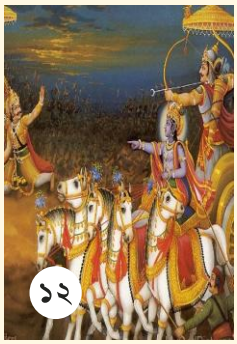

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ

ইন্দ্রিয়সকল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করুন

শাস্ত্রে কথিত আছে যে যদি আমরা একটি শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন যাপন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে পারমার্থিক কর্মে নিয়োজিত করতে হবে। জাগতিক অভিলাষের বিষয়ে চিন্তার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক কর্মের গভীর চিন্তন আমাদের পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতির সহায়ক হবে।

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

ভগবান বলেছেন, মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করলে আমার ভাবই প্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে পাপী হোক আর অন্য সম্প্রদায়ের হোক, বা উত্তরায়ন বা দক্ষিণায়ন, শুক্লপক্ষ কিংবা কৃষ্ণপক্ষ হোক কোন নিয়ম কানুন নেই।

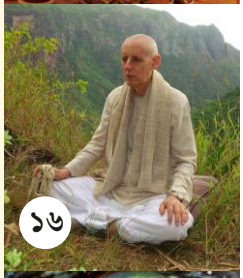

১৭ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

দ্রৌপদী তাঁর নিজের পুত্রশোকে শোকার্ত ছিলেন, এবং তাই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে অশ্বত্থামার মৃত্যু হলে কৃপী কি রকম বেদনা অনুভব করবে এবং তাঁর আচরণ ছিল মহৎ, কেন না তিনি এক মহান পরিবারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

২৪ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

শ্রীকৃষ্ণ নিজলীলা বিলাস দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে নিরন্তর জয় করেছেন। ভক্ত হৃদয়েই ধাম ও লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ উদিত হন। সেই উদিত লীলা জড় জগত সমূহের সমস্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে সর্বতোভাবে জয় করে।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গা

দেবী দুর্গার দশ হাতে ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্র রয়েছে। ত্রি মানে তিন এবং শূল মানে ব্যথা বা যন্ত্রণা। এই তিন প্রকার যন্ত্রণা হল আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ এবং আধিভৌতিক দুঃখ। দেহ ও মন সংক্রান্ত দুঃখকে বলে আধ্যাত্মিক। দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

কৃষ্ণভক্তি করলে কি হয়? না করলে কি হয়?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

মুগ বড়া কারি

২০ ইসকন সমাচার

১২৫তম প্রভুপাদ জন্ম বার্ষিকীতে অকল্যাণ্ডে হরিনাম সংকীর্তন

২৮ ছোটদের আসর

গরুর লেজ ধরে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা

৩০ ভক্তি কবিতা

কাম্যবনে রাস

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

আসন্ন দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গার কাছে কি প্রার্থনা করতে হবে

ব্রহ্ম সংহিতা ৫।৪৪ বিশ্লেষণ করে যে দুর্গাদেবী হলেন এই জড়জগতের ''সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সাধনকারী।'' কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে কোন কর্ম করেন না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে তিনি সকল কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে আবির্ভূত হন।

জড়জগত, যাকে 'দুর্গ' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই কারাগাররূপী দুর্গের কর্ত্রী হলেন দুর্গাদেবী, এই দুর্গকে রক্ষা করার জন্য তিনি তার হাতে দশপ্রকার অস্ত্র ধারণ করেন। সুতরাং যত শক্তিশালীই হোক না কেন এই দুর্গ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।১৪তে শ্রীকৃষ্ণ সুনিশ্চিত করেছেন যে, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*। ''আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়।''

আমাদের মতো মানুষ যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি করণীয় সেবার কথা বিস্মৃত হয়েছে তাদের এই কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং আমরা জীবাত্মাগণ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকি। সেইহেতু এই পার্থিব জগতে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাই না এবং আমরা এখানে যে জড়সুখ ভোগ করি তা সর্বদাই যন্ত্রণাময়।

দুর্গাদেবী হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি। তার হস্তে আমাদের, বন্দীদের সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে যে শাস্তি আমরা পাই তা সর্বদা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এটি আমাদের স্থায়ী নিবাস নয় এবং কোন জড় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের যন্ত্রণামুক্ত করতে পারে না।

তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ বিশ্বাস করে যে জড় ঐশ্বর্যের সাহায্যে তারা এখানে সুখে বসবাস করতে পারে। সেইজন্য তারা ঐশ্বর্য, সম্পদ, সন্তান, সুন্দর পতি, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি জাগতিক বর প্রার্থনা করে দুর্গাদেবীর কাছে। যদিও তিনি অনিচ্ছা সহকারে এই সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন। কারণ তিনি জানেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডে যে চৌদ্দ ভুবন আছে সেখানে কেউ স্থায়ীভাবে সুখী হতে পারে না। এই জড়জগতের পরম সত্য মৃত্যু আমাদের কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে নেবে। সেইহেতু তিনি চান যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করি যেখানে আমাদের জীবনসহ সকলই নিত্য।

দুর্গাদেবী সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হন যখন তিনি কোন আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হবার জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করতে দেখেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন, ''এই সকল শাস্তিপ্রাপ্ত জীবের সংশোধনের কর্মই দুর্গাদেবীর উপর ন্যস্ত হয়েছে। তিনি গোবিন্দের অভিলাষ অনুসারে নিরন্তর এদের মুক্তিপ্রদানের কর্মেও নিয়োজিত আছেন। যখন সৌভাগ্যক্রমে গোবিন্দকে বিস্মৃত হয়ে কারাগারে আবদ্ধ কোন জীব আত্মতত্ত্বজ্ঞানী কোন আত্মার সংস্পর্শে আসে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার সহজাত প্রবৃত্তি তার মধ্যে জাগরিত হয়, দুর্গাদেবী স্বয়ং তখন গোবিন্দের অভিলাষ অনুসারে তাদের মুক্তি প্রদান করেন।''

শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৪৪ তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী দুর্গাদেবী এই পৃথিবীতে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের ভক্তে রূপান্তরিত করাতে আসেন। এই পবিত্র দূর্গাপূজায় আসুন আমরা কোন জাগতিক সম্পদের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাব না। আসুন আমরা পারমার্থিক সম্পদের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করি। আসুন আমরা তার নিকট এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের হৃদয়ের সকল জাগতিক অভিলাষ অপসারিত করে আমাদের তাঁর প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে গড়ে তোলেন।

১৯৭৪ সালের ৬ই জুন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং ইউনাইটেড নেশনস্ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সদস্যবৃন্দের মধ্যে জেনেভায় এই নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়েছিল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা সদস্য ঃ একটি বিষয় আমি মেলাতে পারছি না। একজন ভারতীয় হিসাবে প্রশ্নটি আমাকে প্রায়ই ভাবায়। আমি অনেক মহান বিষয়ই বিশ্বাস করি যা আপনি বলেছেন - সরল প্রাকৃতিক জীবন যাপনে প্রত্যাবর্তন করতে এবং আমাদের আধ্যাত্মবোধে সন্তোষের সন্ধানী হতে। সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। আপনি, যাকে একজন "পাশ্চাত্য ভারতীয়" বলেন আমি তা নই।

কিন্তু যে বিষয়টি আমি মেলাতে পারছি না সেটি হল আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা যাকে আপনি এইমাত্র আমাদের সকল সমস্যার সমাধান রূপে চিহ্নিত করলেন—এই সকল শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সমাজকে অনেক প্রদূষণ থেকে মুক্ত করতে অক্ষম। আমি শুধু দারিদ্র নয়, বেকারী, ক্ষুধা এবং আরও অনেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষার কারণে নয়। খারাপ নেতাদের জন্য যারা এগুলি অনুসরণ করে না। এটির কারণ ত্রুটিপূর্ণ নেতৃত্ব।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা সদস্য ঃ তারা আমাদের নিজেদের লোক। তারা—

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা হতে পারে আমাদের নিজেদের

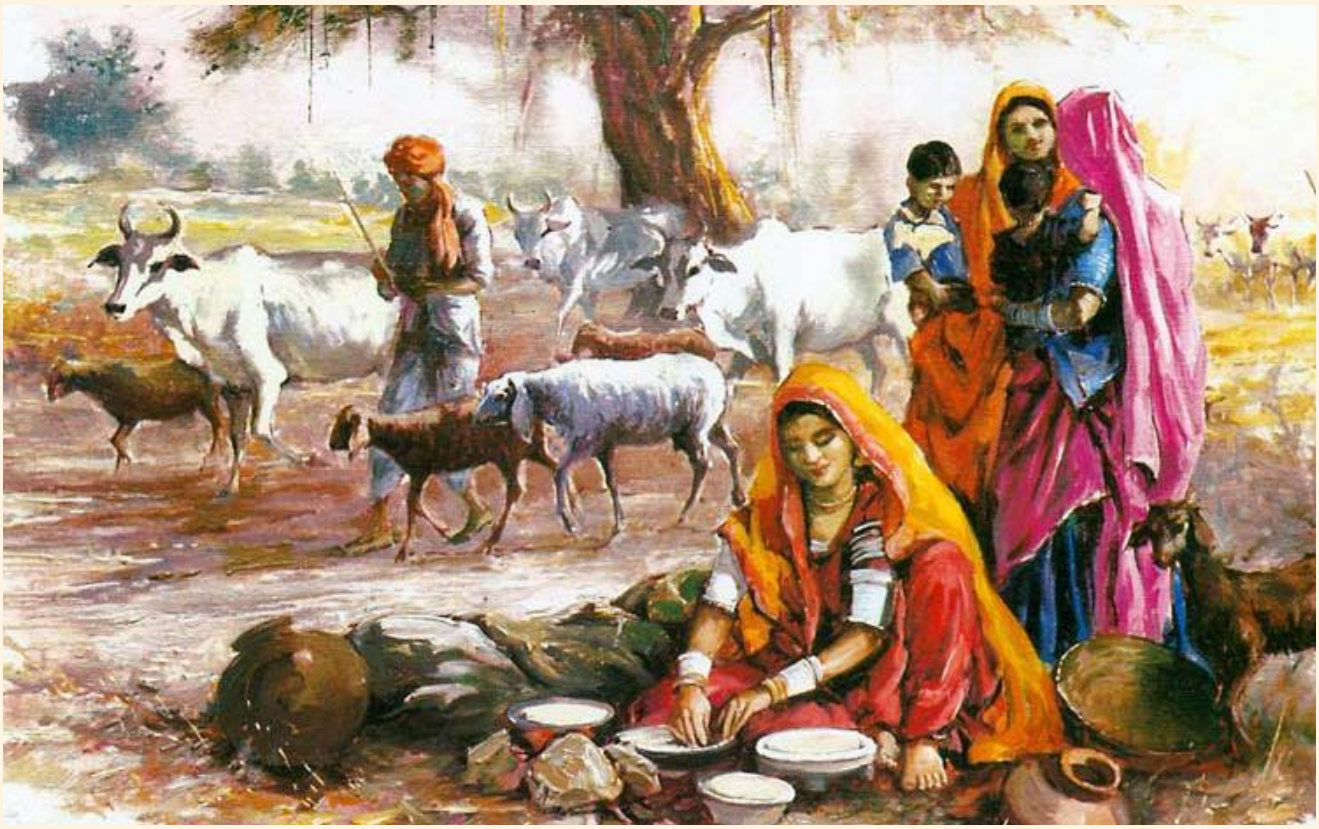

লোক। তারা হতে পারেন আমাদের পিতা। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের একজন ভক্ত ছিলেন। তথাপি তার পিতা ছিলেন ভয়ঙ্কর দানব হিরণ্যকশিপু। সুতরাং কি করণীয়? অধিকাংশ মানুষ ভালো তথাপি প্রায়ই আমরা দেখি যে তাদের নেতাগণ অধার্মিক দানব।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা সদস্য ঃ হাঁ, হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেইজন্য তাকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ভগবানের কৃপায় সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। এবং এই আধুনিক সমাজের প্রতিটি দানব নেতাই—ধ্বংস হবে। এই সকল দানবীয় নেতা থাকবে না। তারা ধ্বংস হবে। কিন্তু সবকিছুর জন্যই সময় লাগে।

এই মুহূর্তে, আমাদের নেতৃবর্গ খুব ভালো নয়, অন্ধ, তাদের কোন জ্ঞান নেই, তথাপি নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

অন্ধাঃ যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ—অন্ধ অন্ধদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই সকল নেতারা জগতের মৌলিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছে কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কিছু দিতে পারছে না।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা সদস্য ঃ তাহলে আপনার আন্দোলন সামাজিক দর্পণের সাথে যুক্ত?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হাঁ, এই আন্দোলন সর্বাধিক বাস্তবসম্মত। উদাহরণস্বরূপ আমরা মাংসাহার বর্জন করতে পরামর্শ দিই। নেতারা এটি পছন্দ করেন না। আমরা তাদের প্রচারের সহায়ক নই। সেইজন্য নেতারা আমাদের পছন্দ করেন না। যেভাবেই হোক তারা কসাইখানার অনুমোদন দিয়েছে। সর্বত্র গোমাংসের দোকানেরও অনুমোদন দিয়েছে। এবং আমরা বলছি "মাংস বর্জন"। জ্ঞানী হওয়া মূর্খতা সেখানে অজ্ঞতাই সুখ।' কিন্তু আমরা তথাপি আন্দোলন করছি। বিকল্প হিসাবে আমরা যা সুপারিশ করছি তাও বাস্তবসম্মত। এই ভগবৎচেতনাময় কৃষিগ্রামগুলি সফল প্রমাণিত হয়েছে। অধিবাসীগণ সুখী প্রাচুর্যময় জীবন পেয়েছেন। প্রাকৃতিক ফলনে ফল, সব্জী এবং শস্য উৎপাদিত হচ্ছে। গরুরা দুধ দিচ্ছে যা থেকে আপনি দই, ছানা, মাখন এবং ক্রীম পাবেন। সুতরাং এই সকল বস্তু থেকে আপনি শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে সুস্বাদু খাবার তৈরী করতে

> আমরা বলি না যে প্রত্যেকে খাদ্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে একটি বিভাগ খাদ্য উৎপাদন করবে, একটি বিভাগ মানুষকে আধ্যাত্মিক দিগদর্শন করাবে এবং একটি বিভাগ রাজা বা সরকার রূপে সমস্ত কিছু পরিচালনা করবে।

পারেন। আপনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হবেন। এই হল মূল নীতি।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা সদস্য ঃ এ তো একটি সফল প্রচেষ্টার উদাহরণ। কিন্তু আপনি এমন কিছু সম্বন্ধে বলবেন যা আগে প্রয়াস করা হয়নি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ "নতুন বিষয়টি" হল যে এই সকল ভগবৎচেতনাময় গ্রামে বসবাসকারীদের প্রতিদিনের রোজগারের জন্য কোথাও বাইরে যেতে হয় না। এইটি হল আধুনিক সমাজের জন্য নতুন বিষয়। বর্তমান, অধিকাংশ মানুষকে কারখানা বা অফিসে যাওয়ার জন্য দূরে যেতে হয়। আমি বম্বেতে ছিলাম সেখানে রেলওয়ে ধর্মঘট হল—ওহ্, মানুষকে কত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আপনি দেখুন? পাঁচটার থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের একটা ট্রেন ধরতে হয়। অবশ্যই ধর্মঘটে কদাচিৎ ট্রেন চলেছে। সুতরাং মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একটা বা দুটো ট্রেন চললে তাতে বহু মানুষকে গাড়ীতে কোনও রকমে নিজেদেরকে ঢোকানোর চেষ্টা করতে হয়েছে। গুঁতোগুঁতি করতে হয়েছে ঢোকার জন্য। তারা এমনকি ট্রেনের উপরেও উঠেছে।

অবশ্য অধিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মানুষ গাড়ীতে করে কারখানা বা অফিসে যায়—সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার বিপদ থেকেই যায়।

সুতরাং প্রশ্ন হল, কেন শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য একজন বাড়ী থেকে এতো মাইল দূরে যেতে বাধ্য হবে? এটি কুসভ্যতা। প্রত্যেকে স্থানীয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করবে। সেটি সুসভ্যতা।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা সদস্য ঃ আমি বুঝতে পারছি আপনার উদ্দেশ্য হল যাতে প্রত্যেকে খাদ্যের বিষয়ে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। কিন্তু সবাই যদি খাদ্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে তাহলে অন্যবিষয়গুলি কে যোগান দেবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমরা বলি না যে প্রত্যেকে খাদ্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে একটি বিভাগ খাদ্য উৎপাদন করবে, একটি বিভাগ মানুষকে আধ্যাত্মিক দিগদর্শন করাবে এবং একটি বিভাগ রাজা বা সরকার রূপে সমস্তকিছু পরিচালনা করবে। বাকী মানুষ অন্যান্য বিভাগকে শ্রমিকরূপে সহায়তা করবে। সবাই কৃষিকাজ করবে না। না। সেখানে অবশ্যই একটি মস্তিষ্ক বিভাগ, একটি পরিচালন বিভাগ এবং একটি শ্রমিক বিভাগ থাকবে। এই বিভাগগুলি স্বাভাবিকভাবে যে কোন সমাজে থাকে। এবং সবাই—আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে কর্ম করবে। প্রতি নগরাদি গ্রামে।

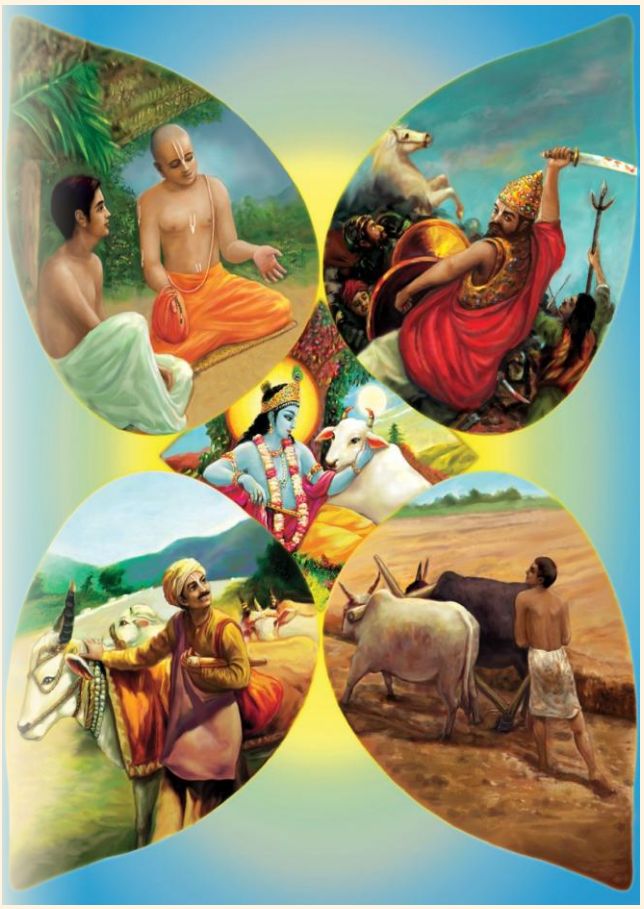

গুরু নির্দেশ পালনই সফলতার চাবিকাঠি

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন যে, প্রত্যেকের সর্বদা সাধু-সঙ্গ লাভের চেষ্টা করা উচিত। কেননা যদি কেউ যথার্থভাবে এক মুহূর্তের জন্যও কোনও মহাত্মার সঙ্গ লাভ করে তাহলে তার মনুষ্য-জীবন সার্থক হয়। কোনপ্রকারে যদি কোন জীব একজন যথার্থ সাধুর সান্নিধ্যে আসতে পারে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে, তাহলে তার মনুষ্য জীবনের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে বুঝতে হবে। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা এই উক্তির বাস্তব প্রমাণ পেয়ে থাকি। শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি প্রভুপাদকে পাশ্চাত্যে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য আদেশ করেছিলেন। কোনরকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না। কোনরকম আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু তবুও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবের আদেশকে শিরোধার্য করে পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণনাম প্রচার করার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের মতে তা সম্ভব হয়েছিল শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতো একজন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে। তাই এ কথা সত্য যে সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত কোন মহাত্মার সঙ্গ এবং তাঁর অনুগ্রহ যদি কেউ লাভ করে, তাহলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। বহু জীবনেও যা লাভ করা যায় না, সাধু-সঙ্গের প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে তা লাভ করা সম্ভব হয়। সেইজন্য বেদ-শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেকের সাধু-সঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করা উচিত এবং জড়জাগতিক মোহগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা একমাত্র মহৎ ব্যক্তির তত্ত্বোপদেশের মাধ্যমেই বদ্ধ জীব জড়বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে একজন যথার্থ সাধু ব্যক্তি এমন ক্ষমতার অধিকারী হন, যার প্রভাবে তিনি বদ্ধজীব বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। কেবলমাত্র মহৎ ব্যক্তির শ্রীচরণকমলের পবিত্র ধূলিকণার স্পর্শে একজন পরমার্থী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভজনের প্রারম্ভে শুদ্ধ-ভক্তের পবিত্র পদরজ দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করতে হবে। ভগবদ্গীতায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যাঁরা মহৎ ব্যক্তি তাঁরা ভগবানের দিব্য শক্তির অন্তর্গত এবং তাঁদের লক্ষণ অনুসারে তাঁদের 'মহৎ' বলে অভিহিত করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মহাত্মার পদরজ মস্তকে গ্রহণ করার

সৌভাগ্য না হয়, ততক্ষণ কারও পক্ষেই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় না। পারমার্থিক জীবনে উন্নতির ক্ষেত্রে গুরু-পরম্পরা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহৎ গুরুদেবের কৃপাতেই কেবল মানুষ একজন মহৎ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যদি কেউ মহৎ ব্যক্তির শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেন, তাহলে তিনিও মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হবার সবরকম সুযোগ লাভ করে থাকেন।

যখন ধ্রুব মহারাজ নারদমুনিকে পারমার্থিক জীবনে সফলতা লাভ করার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন যে, কেবলমাত্র ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালন করলে বা পূজার্চনা করলে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। শাস্ত্রোক্ত ধর্মাচরণগুলি নিঃসন্দেহে ভগবদ্-উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক কিন্তু পারমার্থিক জীবনে যথার্থ সফলতা তখনই অর্জন করা যায়, যখন কেউ মহতের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের আট পংক্তি যুক্ত গুরু-বন্দনায় বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি-বিধানের মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। এমনকি কেউ যদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা সত্ত্বেও

গুরুদেবের প্রীতি-বিধান করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে পারমার্থিক জীবনে ব্যর্থ হবে এবং এইভাবে সে জীবনের পরম লক্ষ্যে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

সাধারণ মানুষ যেহেতু ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করতে পারে না, সেইজন্য তাদের একমাত্র কর্তব্য হল ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তের শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করা। এইভাবে তাদের জীবন সার্থক

শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি-বিধানের মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। এমনকি কেউ যদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা সত্ত্বেও গুরুদেবের প্রীতি-বিধান করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে পারমার্থিক জীবনে ব্যর্থ হবে এবং এইভাবে সে জীবনের পরম লক্ষ্যে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

হতে পারে। একজন সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র ধর্মীয় নিয়মাবলী ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে কখনই পৌঁছাতে পারে না। তাকে অবশ্যই একজন সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর আনুগত্যে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে অকপটভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে তাঁর সেবা করতে হবে। তাহলে সে নিঃসন্দেহে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে কিভাবে সদ্গুরু গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে যথোচিত আচরণ করা উচিত। প্রথমে নিষ্ঠাবান ভক্ত একজন সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর আদেশ গ্রহণ করবে এবং সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদন করার কাজে প্রয়াসী হবে। এটাই হচ্ছে গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক। একজন মহাত্মা বা সদ্গুরুর সান্নিধ্যে যেই আসুক না কেন, তিনি তার উন্নতির জন্য কামনা করেন। কেননা প্রত্যেকেই মায়ার দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে তার মুখ্য যে কর্তব্য, কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া, তা বিস্মৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত মহাত্মা বা সাধু ব্যক্তি সর্বদা কামনা করেন যে প্রত্যেকটি মানুষই সাধু-ব্যক্তিতে পরিণত হোক। সেইজন্য সাধুর মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটি অবহেলিত মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃতে আকৃষ্ট করা ও সেই পথে তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

সদ্গুরু প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী গ্রহণ করে প্রকৃত শিষ্য নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। সদ্গুরুর কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার জন্য প্রত্যেকটি

শিষ্যেরই বিশেষভাবে আগ্রহী হওয়া উচিত। ভগবানের দিব্য কথা শ্রবণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ দিয়ে শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ করা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে গুরুদেব কিছু অর্থের বিনিময়ে তাঁর শিষ্যকে একটি বিশেষ মন্ত্র প্রদান করেন এবং শিষ্য সেই মন্ত্রের উপর ধ্যান করার মাধ্যমে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ছয় মাসের মধ্যেই ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই ধরনের শ্রবণ বা পরমার্থের নামে কপট শিক্ষা মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র। প্রকৃত সত্য হল এই যে, সদ্‌গুরু প্রত্যেকের মন ও স্বভাব অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃতে কে কি ধরনের সেবা সম্পাদন করতে পারবে সেই সম্বন্ধে অবহিত থেকে তাদের উপদেশ প্রদান করে থাকেন।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আপন আপন দক্ষতা অনুযায়ী ভগবানের সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে ভক্ত পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে, ঠিক যে ভাবে অর্জুন তাঁর রণকৌশলের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেছিলেন। অর্জুন সম্পূর্ণভাবে যোদ্ধা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন এবং সেইভাবে তিনি তাঁর জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। ঠিক সেই রকমভাবে একজন শিল্পী শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে চিত্র-অঙ্কনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের সেবা করতে পারেন। ঠিক তেমনই যদি কেউ সাহিত্যিক হন, তাহলে তিনি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবার জন্য ভগবানের সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করতে পারেন। গুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করে এইভাবে আপন আপন দক্ষতা অনুসারে ভগবানের সেবা করতে হয়, কেননা অনন্য ভক্তিতে স্থিত থাকার ফলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সঠিকভাবে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ এবং শিষ্য কর্তৃক তার সুষ্ঠু সম্পাদন—এই উভয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই পারমার্থিক জীবন গড়ে ওঠে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবদ্‌গীতার 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন' শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন যে, যিনি পারমার্থিক জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চান, তাঁকে অবশ্যই শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সেবা-কার্যের জন্য নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেই নির্দেশগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা উচিত। গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশগুলি শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদন করা শিষ্যের প্রধান কর্তব্য এবং সেটি তার জীবনে পরিপূর্ণতা আনে। শিষ্যকে শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে অতীব সচেতনতার সঙ্গে ভগবদ্‌তত্ত্ব সমূহ শ্রবণ করতে হবে এবং সেগুলি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে। তখনই তার জীবন সফল হয়ে উঠবে।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন১। একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক ব্যক্তি তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের বলছেন, 'জপ মালা নিতে নেই। মালা জপের জ্বালা অনেক।' এই কথার উত্তর কি? —**প্রতীম রায়,** পশ্চিম মেদিনীপুর

উত্তর ঃ পঞ্চাশ বছর বয়সে তো জ্বালা অনেক। চোখে দৃষ্টি শক্তি কমে যাবে। কানে শ্রবণ শক্তি কমে যাবে। হাত-পা ব্যথা ব্যথা। শরীর ভারী ভারী। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কত বাছবিচার করে চলতে হবে। নইলে শরীর ঠিক থাকবেই না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দাদু বলে ডাকবে। অর্থাৎ বুড়ো মানুষ বলে গণ্য হচ্ছেন। ওই সময়টা আড্ডা দেওয়া, গল্প গুজব করা, খেলা করা, টিভি দেখে সময় কাটানোর জন্য নয়। যদি ওই সব করেন, তবে ছোটদের কাছে 'বেকার বুড়ো' বলে পরিগণিত হবেন। আর, ওই বয়সে আগের থেকে অভ্যাস না থাকার কারণে হরিনাম জপ করতে তেমন আগ্রহ আসবে না। ছেলে বৌমারাও দেখতে চাইবে না যে, বুড়োর কোনও পরমার্থ জমা আছে কিনা। কিন্তু তারা অবশ্যই দেখবে যে, বুড়োর কত অর্থ জমা আছে। টাকা যদি দিতে পারো তবে কিছুটা আদর খাতির পাবে, নইলে সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে পচে পচে মরতে হবে।

শুনেছি একসময় পরিবারের ঝুট ঝামেলার মধ্যে নাক না গলিয়ে স্বেচ্ছায় বয়স্ক লোকেরা কিংবা মৃতকল্প অসুস্থ মাতা-পিতা সজ্ঞানে গঙ্গার তীরে আসত। এখানে শান্ত পরিবেশে পাতার ছোট কুটির বানিয়ে থাকা, যা পায় তাই সামান্য কিছু খাওয়া দাওয়া, গঙ্গাস্নান এবং হরিনাম জপ করে তারা দিন যাপন করত। যারা কোনক্রমে সুস্থ হতো তারা পুনরায় সংসারে গেলে পাছে কোনও অমঙ্গল হয় এই ভয়ে আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটিয়ে সংসারের সুখ-দুঃখ চিন্তা বাদ দিয়ে যে কয়টা দিন জীবনের বাকী সময়টুকু শান্ত পরিবেশে শান্তিতে হরিনাম করেই অতিবাহিত করা। এজন্য ঐ স্থানের নাম শান্তিপুর (নদীয়া)।

কিন্তু যাঁরা ঘরে সংসারে রয়েছেন, তাঁরা ঘরে বসেই হরিনাম করা, ছেলে-বৌমা নাতি-নাতনীদের হরিকথা শোনানো, গীতা-ভাগবত পাঠ করা—এই সব একটি ভক্তিপূর্ণ পরিবেশ রচনা করবেন। কেননা, জানবেন এটা অনিত্য জীবন, তাতে আবার নানা বিপদের ঝুঁকি, তার মধ্যে যদি আবার হরিনাম শূন্য দিনগুলি হয়, তবে অমোঘ কালচক্রে নারকীয় যন্ত্রণা অপেক্ষা করছেই। এখনও লোকে কেউ মারা গেলে, শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বলে, হে জীবাত্মা, তুমি এখন কোথায় গিয়ে পড়বে তার কোনও ঠিক নেই। কেননা তুমি হরিনাম করনি। ফাঁকি দিয়েছ। হে জীবাত্মা, যদি তুমি অন্তরীক্ষ থেকে আমাদের কথা শুনতে পাও, তবে অবশ্যই 'বলো হরি'—হরিনাম উচ্চারণ করো। তোমার শান্তি কামনায় আমরাও দিচ্ছি 'হরি বোল'—হরিনাম করার পরামর্শ। ভক্ত মানুষ জানে, হরিনামের মালা না নিলে নরকের জ্বালা পেতেই হবে।

প্রশ্ন২। কৃষ্ণভক্তি করলে কি হয়? না করলে কি হয়? —**তৃপ্তিময়ী জাহ্নবী দেবী দাসী,** গৌরনগর

উত্তর ঃ এই জড়জগত দুঃখময়। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে পূর্ণ যাতনাময় জগত। বিবিধ ক্লেশ—আধ্যাত্মিক বা দেহ ও মন থেকে দুঃখ, আধিভৌতিক বা অন্য ব্যক্তি বা জীবজন্তু থেকে দুঃখ, আধিদৈবিক বা দেবতাদের দ্বারা দুঃখ যাকে বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই সমস্ত কিছু আমরা কেউই চাই না। কিন্তু এসব পেতে আমরা বাধ্য। এই জগতে প্রতি পদে পদে বিপদ আপদ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। যা চাই তা পাই না। যা পাই তা চাই না। সব সময় কিছু না কিছু ঘাটতি, অভাব, সমস্যা। এটাই এই জড় জগতের বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত পরিস্থিতি সহজেই মেনে নিয়ে যদি আপনি আনন্দ পান তাহলে আপনার কিছু করা, না করা, যা ইচ্ছা তাই করা—নিয়ে কারও বিচার করার কিছু নেই। যেমন, গোবরা মাতাল যা হলো, হলো, না হলো নাই, কেবল আনন্দে হাসতে থাকে।

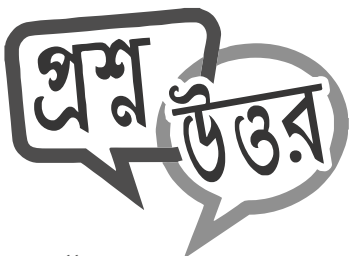

কিন্তু যদি এসব পরিস্থিতি থেকে আপনি চিরতরে মুক্ত থাকতে চান, যদি সমস্ত অভাব পূরণ করতে চান, যদি নিত্য সুন্দর জ্ঞানময় আনন্দময় ভাবময় জীবন পেতে চান, তাহলে আপনাকে কৃষ্ণভক্তি অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে।

তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্।।

''হে ভারত, জড়জগতে ভয়ংকর অবস্থা থেকে যারা মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাদের অবশ্যই সর্বজীবের অন্তর্যামী, পরম নিয়ন্তা, সমস্ত দুঃখ হরণকারী শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে।" (ভাগবত ২।১।৫)

আর, যারা হরিভজন করবে না, তাদের এই জড়জগতে নানা দেহ নিয়ে বারংবার জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হবে আর কষ্ট পেতে হবে।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদ্ আত্ম-প্রভবম্ ঈশ্বরম্।
ন ভজন্তি অবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্তি অধঃ।।

এরপর ২৩ পাতায়.....

ইন্দ্রিয়সকল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করুন

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

একটি শান্তিপূর্ণ, সফল এবং সুখী জীবনযাপনের জন্য ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণ না করি সেক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সকল আমাদের নিয়ন্ত্রিত করবে। আমাদের খামখেয়ালীভাবে কাজ করতে বাধ্য করবে ও অধিকাংশ সময় আমাদের চিন্তান্বিত রাখবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ২।৬২ এবং ২।৬৩ শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কিভাবে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ এক ব্যক্তি সর্বদা ইন্দ্রিয়গুলিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে পরিশেষে কষ্টভোগ করে।

আসুন দেখি কিভাবে এটি ঘটে –

কিভাবে অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সকল কোন ব্যক্তির পতন ও কষ্টের কারণ হয় ?

কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখদায়ক কোন বস্তুর বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় বস্তুর উপর গভীর চিন্তা ধীরে ধীরে জাগতিক অভিলাষের উদ্রেক করে এবং সেই ব্যক্তি ভাবে যে এই জাগতিক অভিলাষটি পূর্ণ হলেই সে সুখী হবে।

ইন্দ্রিয়সুখকর বস্তুর বিষয়ে অবিরাম চিন্তন ধীরে ধীরে তার প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করে। আসক্তি ক্রমান্বয়ে কামনায় রূপান্তরিত হয়।

কামনার অভিলাষ পূর্ণ করা সহজ নয়, সেইজন্য কামনা পূর্ণ না হলে সেই ব্যক্তি হতাশায় ক্রুদ্ধ হয় এমনকি বহু সময় হিংস্রও হয়ে ওঠে । ক্রোধ থেকে সম্মোহন বা মোহ জন্মায়। সম্মোহনের ফলে স্মৃতিভ্রংশ হয়। ঐ ব্যক্তি অতীতের সকল সদুপদেশ এবং খারাপ অভিজ্ঞতাগুলি ভুলে যায়। স্মৃতিবিভ্রম বুদ্ধিনাশ করে। বুদ্ধিনাশের ফলে সেই ব্যক্তি মূর্খের মতো কর্ম করে এমনকি কখনও পাপকর্মেও লিপ্ত হয়।

এটি তার পতনের কারণ হয় এবং যন্ত্রণা নিয়ে আসে। সেইজন্য সবকিছুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপর গভীর চিন্তন থেকে শুরু হয়। এমন নয় যে শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তুর উপর মনোসংযোগ করলেই আমরা পতিত হব। আমাদের যে কোন একটি অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় আমাদের জীবন ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে।

সেইহেতু ভগবদ্গীতা ২।৬৭ তে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘প্রবল বায়ু নৌকাকে যেমন জলের উপর দ্রুত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনই সদা বিচরণকারী যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণের ফলে মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।’’

আমরা কি ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পারি ?

সেইজন্য যদি আমরা পতিত হতে এবং কষ্টভোগ করতে না চাই সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যা

আমাদের করতে হবে সেটি হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সম্বন্ধে গভীর চিন্তন বন্ধ করতে হবে। জাগতিক অভিলাষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চলবে না।

জাগতিক অভিলাষ আমাদের সুখী করতে পারে না। যদি আমরা এমনকি আমাদের জাগতিক অভিলাষ পূর্ণও করি তথাপি আমরা অসন্তুষ্ট থাকব। আমরা ইতিমধ্যেই বহুবার এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। পার্থিব বস্তুসমূহ কখনোই আমাদের সন্তোষ প্রদান করতে পারে না কারণ আমরা ''চিন্ময় আত্মা'', আমরা ''জড় আত্মা'' নই।

সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে কি করব? আমাদের কি ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যাবলী বন্ধ করে দেওয়া উচিত?

অবশ্যই না। ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বদা কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে। এদের ক্রিয়া বন্ধ করতে পারা যাবে না। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয় গুলিকে কর্ম দিতে হবে।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে যদি আমরা একটি শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন যাপন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে শ্রীগোবিন্দের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করার চেষ্টা করতে হবে। জাগতিক অভিলাষের বিষয়ে চিন্তার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক কর্মের গভীর চিন্তন আমাদের পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতির সহায়ক হবে।

যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অধ্যাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবে, চিন্ময় আত্মা তখন আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করবে এই জগতে যার সন্ধান আমরা সর্বদা করছি।

কিভাবে ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বদা পারমার্থিক কর্মে নিয়োজিত করা যায়?

ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরন্তর পারমার্থিক কর্মে নিয়োজিত করা কঠিন নয়। শ্রীমদ্ভাগবতম মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মহান রাজা সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহকে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে নিয়োজিত করেছেন। আসুন আমরা দেখি তিনি কিভাবে এটি করেছেন।

''মহারাজ অম্বরীষ সর্বপ্রথমে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁর বাণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর হস্ত দ্বারা তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনা করেছিলেন, তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ভবানের লীলা শ্রবণ করেছিলেন। তাঁর চক্ষু দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপদর্শন করেছিলেন এবং তাঁর গাত্রের দ্বারা তিনি ভগবৎ ভক্তকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি ভগবানের শ্রীচরণ অর্পিত পদ্মফুলের ঘ্রাণগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জিহ্বার দ্বারা ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদযুগল দ্বারা তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানে এবং ভগবানের মন্দিরে সমন করেছিলেন। তাঁর মস্তকের দ্বারা তিনি ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত কামনাকে তিনি ভগবানের সেবা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত অপ্রাকৃত কর্মগুলি শুদ্ধভক্তেরই যোগ্য সেবা।'' (শ্রীমদ্ভাগবতম ৯।৪।১৮–২০)

এইসব পারমার্থিক কর্মের দ্বারা অম্বরীষ মহারাজের ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই হেতু তিনি সর্বদা শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দিত থাকতেন। এই মহান রাজা আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে কৃষ্ণভাবনার দ্বারা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কেন একজন ভক্তকে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন?

একবার আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণভাবনাময় কার্যে নিয়োজিত হলে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এতে আমাদের আর একা ইন্দ্রিয়গুলির সাথে যুদ্ধ করতে হবে না। আমাদের একার প্রচেষ্টায় ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের কাজ অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত হই, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু ইন্দ্রিয়সকলের অধীশ্বর, হৃষীকেশ, তাই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, ''যেমন উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ

করে শত্রুদের দমন করা যায়, ইন্দ্রিয়গুলিকেও তেমনভাবে দমন করা যায়, কোন মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয়, কেবল সেগুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত রাখার মাধ্যমেই তা সম্ভব।" (গীতা ২।৬৮ তাৎপর্য)

ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আমাদের কি জাগতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া প্রয়োজন?

এমন নয় যে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আমাদের জড়জাগতিক দায়িত্বগুলি থেকে পলায়ন করে বৈরাগী হতে হবে। অনেকে এই মিথ্যা ধারণা পোষণ করেন যে, বৈরাগ্যের অর্থ জাগতিক কর্তব্য ত্যাগ করা। অর্জুনও তাই ভেবেছিলেন। সেইজন্য তিনিও তাঁর যুদ্ধ করার কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, ''যুদ্ধে বিরত থেকে বনে গমন করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবনধারণ করা আমার নিকট শ্রেয়।"

অর্জুন ভেবেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আত্মত্যাগের অভিলাষের প্রশংসা করবেন।

কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হননি। তিনি অর্জুনের কর্মের থেকে অব্যাহতি চাওয়ার এই ধারণাকে অনুমোদন করেননি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ''কর্মত্যাগ বলতে তুমি কি বোঝ? এই জগতে তুমি কর্মত্যাগ করে জীবনধারণ করতে পারবে না। এমন কি এই নশ্বর দেহকে প্রতিপালন করার জন্য তোমাকে কর্ম করতেই হবে।"

কেউ বাহ্যিকভাবে কর্তব্য থেকে অব্যাহতি নিতে পারে, কিন্তু তার মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ এখানেই থাকবে। অর্জুন তার ক্ষত্রিয়সুলভ কর্তব্যকর্ম যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি নিতে পারে কিন্তু তার মনে তিনি নিরন্তর শত্রুদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকবেন এবং সংবিগ্ন হবেন। যদি তার ভিক্ষা করার সময় কেউ ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে, তিনি রুষ্ট হবেন। তাঁর ক্ষত্রিয় যোদ্ধাসুলভ শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনধারনের উপযুক্ত নয়। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ একজন ব্রাহ্মণের জন্য আদর্শ যিনি তার জীবন ভগবত সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর প্রকৃতি অনুসরণ করে শাস্ত্রানুসারে কর্তব্যকর্ম পালন করতে অনুমোদন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিরাসক্তভাবে কর্ম যোগ (কৃষ্ণভাবনামৃত) অভ্যাস করতে উপদেশ প্রদান করেন। এটি তার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সুনিশ্চিতরূপে ভগবত সেবায় নিয়োজিত করবে।

আমাদের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ কি?

অর্জুনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জীবন সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। আমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া উচিত নয়, পরন্তু শাস্ত্রের নির্দেশকে কেন্দ্রে রেখে আমাদের কর্ম করা উচিত। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োজিত করে তাদের শুদ্ধিকরণের এটিই সর্বোত্তম উপায়। যদি আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হই তাহলে আমরা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে আনন্দে জীবন যাপন করতে পারব।

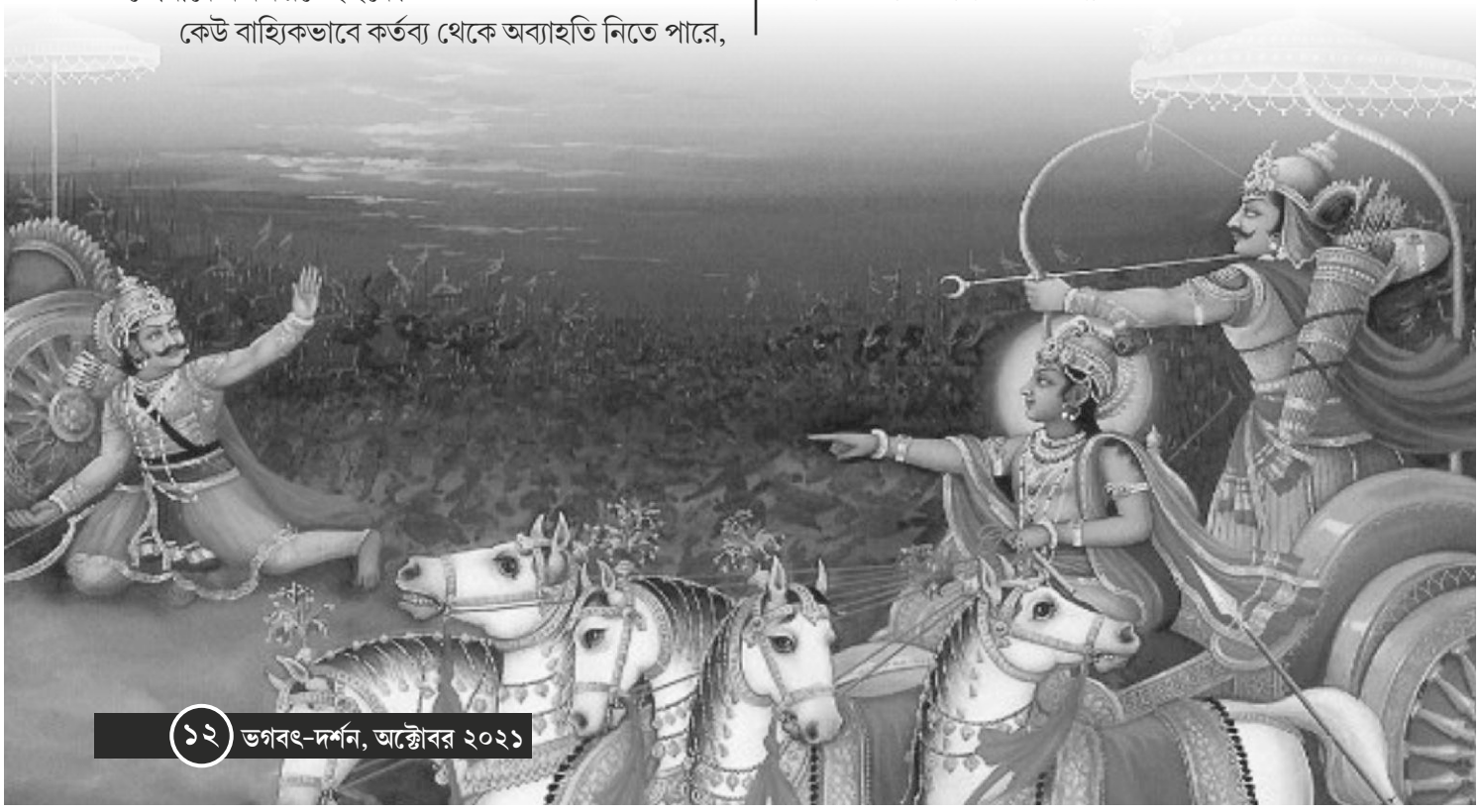

মুগ বড়া কারি

উপকরণ ঃ খোসা ছাড়ানো মুগডাল ৩০০ গ্রাম। পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ ও চিনি। গোটা জিরে ২ চা-চামচ। আমূলের টক দই ২ কাপ। বেডিং পাউডার ১ চিমটা। বেসন ১ টেবিল চামচ। গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চা-চামচ। কারিপাতা আন্দাজ মতো। কাঁচালংকা ও আদা কুচি মিলিয়ে ১ টেবিল চামচ। কালো সরষে ১ চা-চামচ। ধনেপাতা কুচি আধা কাপ। পাতিলেবুর রস ২ চা-চামচ। ঘি ৫০ গ্রাম। তেল ১৫০ গ্রাম।

রন্ধন প্রণালী ঃ শুকনো কড়াইতে মুগের ডাল ভেজে নিয়ে একটা বাটিতে ২ ঘন্টা মতো জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর জল ঝরিয়ে লবণ ও ২টি কাঁচা লংকাসহ ওই ডাল মিক্সিতে বেটে নিন। তারপর তাতে বেকিং পাউডার দিয়ে ফেটিয়ে নিন।

উনানে কড়াই গরম করুন। তাতে তেল দিন। আধা কাপ ডালবাটা রেখে বাকী ডালবাটা ছোট ছোট বড়া ভেজে তুলে রাখুন।

এবার আধা লিটার জল গরম করে তাতে একটু লবণ মিশিয়ে দিয়ে ভাজা বড়াগুলো ১০ মিনিট ঐ জলের মধ্যে ফেলে রাখুন। তারপর চিপে চিপে তুলে নিন।

বেসন শুকনো কড়াইতে একটু ভেজে নামিয়ে নিয়ে তার মধ্যে টক দই, গোলমরিচ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। আধা কাপ রাখা ডালবাটা ওই দই মিশ্রণে মিশিয়ে ফেটান।

এবার একটা কড়াইতে এই ফেটানো মিশ্রণটি ঢেলে উনানে কড়াই বসিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন, যাতে কড়াইয়ের গায়ে জড়িয়ে না যায়। অবশ্য আঁচ হালকা রাখতে হবে। ১৫ মিনিট ফোটাতে হবে। ফোটানোর সময় লবণ, চিনি, কারিপাতা দিয়ে দিন। তারপর ভাজা বড়াগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আঁচ বন্ধ করুন। কড়াইতে ঢাকনা চাপা দিন।

অন্য একটা কড়াই উনানে বসিয়ে গরম হলে তাতে ঘি দিয়ে কালো সরষে, গোটা জিরে ফোড়ন দিন। আদা কুচি, লংকা কুচি দিয়ে খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। সুগন্ধ উঠলে ধনেপাতা দিয়ে নাড়িয়ে দিন। এবার এই ফোড়ন মিশ্রণটি আগের কড়াইতে ঢাকনা খুলে মিশিয়ে দিন। তারপর লেবুর রস দিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে গরম অন্ন বা পরটার সঙ্গে এই মুগবড়া কারি ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

অর্জুনের অষ্টম প্রশ্ন

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অর্জুন আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য ১৬টি প্রশ্ন করেছিলেন—তার মধ্যে অষ্টম প্রশ্নটি ছিল (গীঃ ৮/১-২)

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্ট করে বল এবং দ্বিতীয় নং শ্লোকে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? এবং এই দেহের মধ্যে তিনি কি রূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কি ভাবে তোমাকে জানতে পারেন?

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—অর্জুন এই রকম প্রশ্ন কেন করলেন? এর উত্তর হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে অর্থাৎ ২৯ ও ৩০নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অর্জুন এই শব্দগুলির অর্থ আরো পরিষ্কার ভাবে জানার জন্য অষ্টম অধ্যায়ের ১নং ও ২নং শ্লোকে আটটি প্রশ্ন করেছেন। ভগবান খুব সুন্দর ভাবে ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ৩নং ও ৪নং শ্লোকে। এবং শেষ প্রশ্নের উত্তর সবিস্তারে পুরো অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

১। ব্রহ্ম কি?—জীবাত্মা যা অবিনশ্বর। ২। অধ্যাত্ম কি? জীবের স্বভাব বা প্রকৃতি। ৩। কর্ম কি?—দেহ ধারণের জন্য সংসার ধর্ম পালন। ৪। অধিভূত কি?—নশ্বর জড় জগৎ। ৫। অধিদৈব কি? ভগবানের বিশ্বরূপ (যিনি দেব-দেবী ও তাদের লোক

সমূহ পরিচালনা করেন) ৬। অধিযজ্ঞ কি? যজ্ঞের ভোক্তা (যিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণ) ৭। অধিযজ্ঞ কোথায় অবস্থান করেন?—সকলের হৃদয়ে। ৮। মৃত্যুকালে কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়? এর উত্তর পরবর্তী অংশ জুড়ে।

প্রথম প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি?

ব্রহ্ম বলতে জীবকে বোঝায় এবং পরব্রহ্ম বলতে পরম ব্রহ্মকে বোঝায়, তিনি হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। জড় চেতনায় জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কিন্তু পারমার্থিক চেতনায় জীব ভগবানের সেবা করতে চায়। জীব যখন জড়া প্রকৃতিতে ভোগের বাসনা নিয়ে কর্ম কতে থাকে তখন কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখী আদির শরীর প্রাপ্ত হয়। কখনও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় সেখানে তার পুণ্য সমাপ্ত হয়ে গেলে সেখান থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তারপর শস্যকণায় পরিণত হয়। তারপর যখন মানুষ শস্যকণা গ্রহণ করে এবং তা বীর্যে পরিণত হয়, তারপর সেই বীর্য স্ত্রীযোনীতে সঞ্চারিত হয়ে গর্ভবতী করে। এই ভাবেই জীবাত্মা আবার মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে — এইভাবে প্রতিনিয়ত এই জড় জগতে গমনাগমন করে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তির পন্থা অনুশীলন করলে জীব সরাসরি ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়—তাকে আর জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয় না।

ভগবান বলেছেন, মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করলে আমার ভাবই প্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে পাপী হোক আর অন্য সম্প্রদায়ের হোক, বা উত্তরায়ন বা দক্ষিণায়ন, শুক্লপক্ষ কিংবা কৃষ্ণপক্ষ হোক কোন নিয়ম কানুন নেই। তাহলে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন—সারা জীবন কেন কষ্ট স্বীকার করবো বা কেনই বা রাত্র-দিন হরিনাম করবো।

দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষা জগাই মাধাই।

তারপর শাস্ত্রে এও আছে—

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।।

তাহলে শাস্ত্র অনুযায়ী এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথানুযায়ী মৃত্যুর সময় একবার স্মরণ করে নেবো। এর উত্তর হচ্ছে বলা সহজ, করা খুবই কঠিন। কারণ সাধারণ বিপদে যদি কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলে না ডাকি তাহলে 'গরুড় পুরাণে' উল্লেখ আছে মৃত্যুর সময় চল্লিশ হাজার কাঁকড়া বিছা কামড়ানোর যন্ত্রণা পাবো—সেই সময় অভ্যাস না থাকলে পারব না। একজন বাইরের দেশের ভক্ত ক্লাস দেওয়ার সময় বললেন---অষ্টম অধ্যায় হলো জীবনবীমা—যেমন জাগতিক জীবনবীমা করে রাখলে মৃত্যুর সময় সে পাবে না কিছু; কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনরা পাবে। কিন্তু এই জীবনবীমা এমনই আপনি যা করবেন তার ফল আপনি নিজে পাবেন অন্য কেউ নিতে পারবে না। তাই সময় থাকতেই আপনি আপনার জীবনবীমা স্বরূপ ভগবানের নাম গ্রহণ করুন। কারণ—শ্রীল

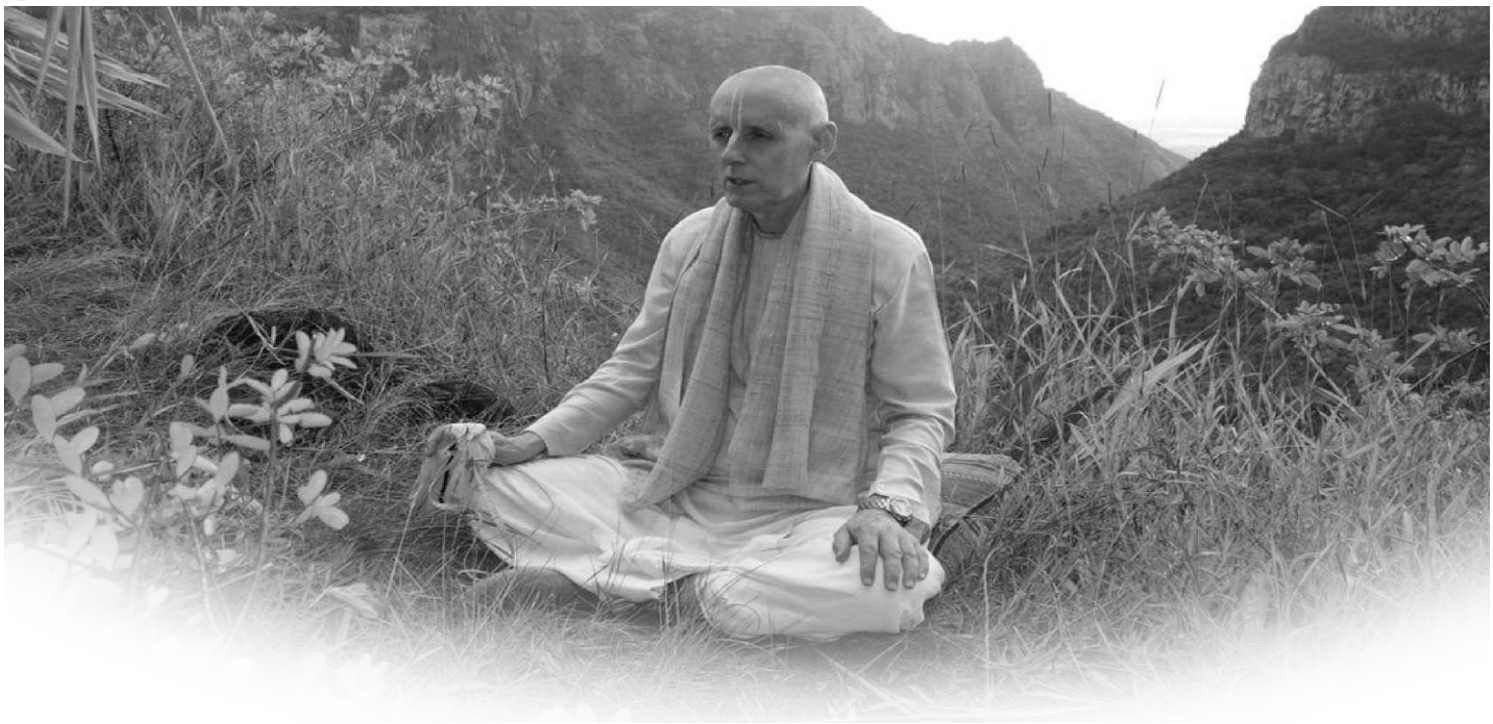

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা গানে উল্লেখ করেছেন—

জীবন অনিত্য জানহ সার
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে।

আপনি আপনার কাজ নিয়ে থাকুন আর সময় পেলে বা কাজের মধ্যে থেকেও আপনি ভগবানের চিন্তায় যুক্ত থাকতে পারেন। যেমন—একজন মা তার কাজের মধ্যে থাকলেও বাচ্চার কথা চিন্তা করতে থাকে। কারণ—অভ্যাস না থাকলে মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করতে পারবেন না। আর যেমন চিন্তা করবেন মৃত্যুর পর সেই রকম দেহ প্রাপ্ত হবেন। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে উল্লেখ আছে, ভরত মহারাজ ভক্তির চরম স্তরে পৌঁছে ছিলেন কিন্তু একটা হরিণ শিশুর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন—মৃত্যুর সময় তার কথা চিন্তা করতে করতে দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে হরিণের দেহ লাভ করেছিলেন। ভাগবতের চুতর্থ স্কন্ধে মহারাজ পুরঞ্জন তাঁর স্ত্রীর কথা চিন্তা করতে করতে দেহ ত্যাগ করেছিলেন তাই স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন। একজন ভক্ত হাসতে হাসতে বলছিলেন বর্তমান যুগে বেশি কন্যা সন্তান হচ্ছে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, বর্তমান যুগে বেশি বিবাহ হচ্ছে ছেলের বয়স কমপক্ষে ১২ বৎসর থেকে ১৮ বৎসরের বড় মেয়ের থেকে—স্বাভাবিক কারণেই ছেলেরা আগে মারা যাবে এবং মৃত্যুর সময় চিন্তা করে, আমার স্ত্রীকে কে দেখবে চিন্তা করতে করতে মারা যায় আর স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হয়। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—তাহলে গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বসে বসে কৃষ্ণের নাম জপ করা সব কিছু কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সংশয় নাশ করেছেন—অর্জুনের মাধ্যমে—গীতা ৮/৭

''তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'' অতএব হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন। ভগবান বলছেন না যে, মানুষকে তার কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ তার নিজের কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে।

জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী ও অষ্টাঙ্গযোগীদের মৃত্যুর গতি নির্ভর করে কোন পক্ষে বা দিনে না রাত্রিতে এমনি কি উত্তরায়ণ না দক্ষিণায়ণ কোন সময় দেহ ত্যাগ করেছেন তার উপর নির্ভর। কিন্তু তুমি যদি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর তাহলে ভগবান কথা দিয়েছেন বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে সেই সমুদয়ের যে ফল ভক্তি যোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণপুত্র দণ্ডিত
গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

অধ্যায়ের সার কথাঃ

শ্লোকঃ ১–১১

বদ্ধজীবদের দুঃখ ক্ষোভ মুক্ত করার জন্য ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতম রচনা করলেন এবং তা তিনি তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে পড়িয়ে ছিলেন। শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুকদেব গোস্বামী যিনি ইতিমধ্যেই আত্মারাম স্তরে অবিকৃত ছিলেন, তথাপি কেন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতম্ অধ্যয়ন করার ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন? সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন, শ্রীদ্ভাগবতম্ আত্মারামদেরও আকৃষ্ট করেন।

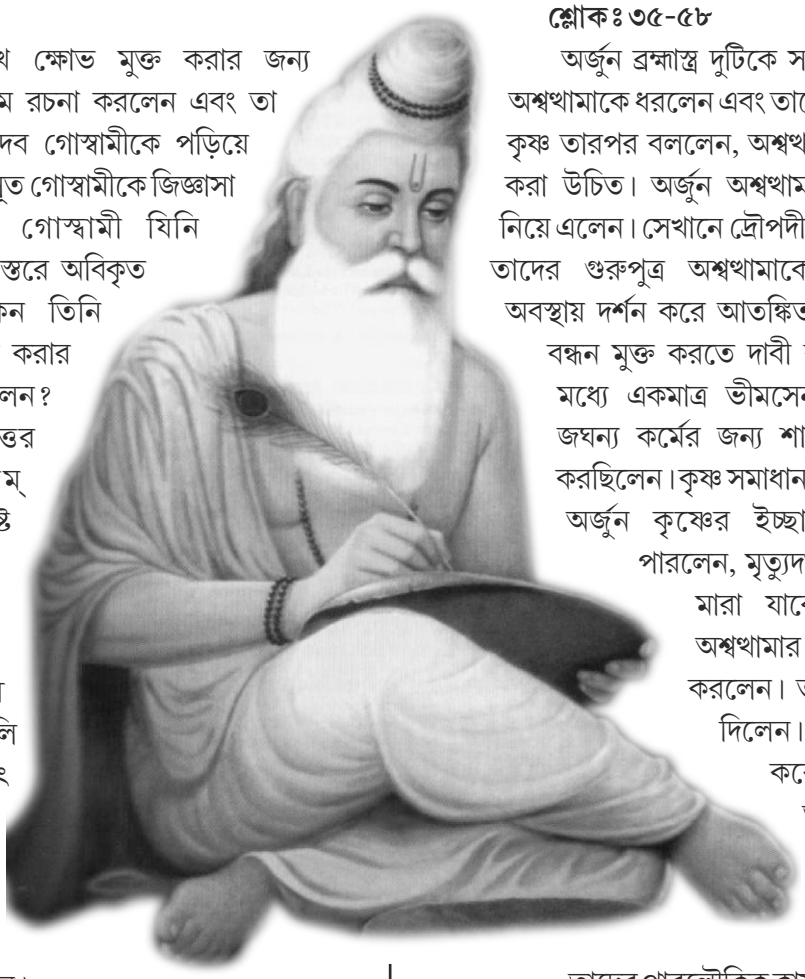

শ্লোকঃ ১২–৩৪

সূত গোস্বামীর কাছে শৌনক ঋষি পূর্ববর্তী যে প্রশ্নগুলি শ্রীকৃষ্ণ, রাজা পরীক্ষিৎ এবং পাণ্ডবদের কার্যাবলী সম্পর্কে করেছিলেন সেই গুলির উত্তর প্রদান করতে আরম্ভ করলেন। তিনি শুরু করলেন এই বলে যে, অশ্বত্থামা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্তির পর নিদ্রারত পাণ্ডব কুমারদের হত্যা করলেন। তারপর অশ্বত্থামা পলায়ন করেছিলেন এবং অর্জুন তাকে ধরার জন্য নির্গত হয়েছিলেন। অশ্বত্থামা তার জীবন বিপন্ন দেখে, তার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে ভীত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশক্রমে তার ব্রহ্মাস্ত্রও নিক্ষেপ করলেন এবং পরে দুটি ব্রহ্মাস্ত্রকেই সংবরণ করলেন।

শ্লোকঃ ৩৫-৫৮

অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র দুটিকে সংবরণ করলেন এবং অশ্বত্থামাকে ধরলেন এবং তাকে রজ্জুবদ্ধ করলেন। কৃষ্ণ তারপর বললেন, অশ্বত্থামাকে অবশ্যই হত্যা করা উচিত। অর্জুন অশ্বত্থামাকে পাণ্ডব শিবিরে নিয়ে এলেন। সেখানে দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা তাদের গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে এভাবে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দর্শন করে আতঙ্কিত হলেন। তাঁরা তার বন্ধন মুক্ত করতে দাবী করলেন। পাণ্ডবদের মধ্যে একমাত্র ভীমসেন, তিনি অশ্বত্থামার জঘন্য কর্মের জন্য শাস্তিস্বরূপ মৃত্যু দাবী করছিলেন। কৃষ্ণ সমাধান সংকেত দিলেন এবং অর্জুন কৃষ্ণের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারলেন, মৃত্যুদণ্ড হবে কিন্তু প্রাণেও মারা যাবে না। তাই তিনি অশ্বত্থামার মস্তকের মণিটি ছেদন করলেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন। অশ্বত্থামাকে মুক্ত করে দিয়ে পাণ্ডবেরা তাঁদের আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে যারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন তাদের পারলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ের বর্ণনা করা হয়েছে, পরীক্ষিত মহারাজ যখন তার মাতৃগর্ভে ছিলেন। তখন কিরকম অলৌকিকভাবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে এবং সে জন্য অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করার পূর্বে শ্রীল ব্যাসদেব ধ্যানে তা জানতে পেরেছিলেন।

সূত গোস্বামী বললেন, একদিন ব্যাসদেব সরস্বতী

নদীর তটে শম্যাপ্রাস নামক স্থানে তাঁর আশ্রমে ধ্যানস্থ হলেন। তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের চেয়ে মায়া শক্তি বহু দূরে অবস্থিত এবং তিনি বদ্ধ জীবের রোগগ্রস্ত অবস্থা এবং তাদের রোগের কারণ দর্শন করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণপুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে এবং তাঁর সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশও দর্শন করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে মায়া শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের দুঃখ দুর্দশাও দর্শন করেছিলেন। এই সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছিলেন যা নিয়মিত ভাবে শ্রবণ কীর্তন করার ফলে শোক, মোহ ও ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তিনি তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে তা শিক্ষাদান করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন আত্মারাম কিন্তু তবুও তিনি মহান সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবতম্ অধ্যয়ন করার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে সমস্ত আত্মারামেরা, তাঁদেরও অধ্যয়নের বিষয়। শ্রীল নারদমুনির কৃপায় শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত মহাকাব্য বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ব্যাসদেবের কৃপায় শুকদেব গোস্বামী তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

সূত গোস্বামী বললেন, মুখ্যভাবে কৃষ্ণকথাই যাতে উদিত হয় তাই আমি পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম, কর্ম বৃত্তান্ত ও দেহত্যাগ এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করব।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের যে অপ্রাকৃত বর্ণনা রয়েছে তার শুরু হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে যেখানে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন।

কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের বীরেরা যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সমবেত হয় এবং ভীমের পদাঘাতে ভগ্ন উরু দুর্যোধন ধরাশায়ী হয়। অশ্বত্থামা তখন দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে তাদের মস্তক দুর্যোধনকে দান করে কিন্তু দুর্যোধন তাতে মোটেও প্রীত হন নি। পাঁচ পুত্রের জননী দ্রৌপদী তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁর গভীর শোক শান্ত করার উদ্দেশ্যে অর্জুন তাঁকে বললেন – হে ভদ্রে, আমার গান্ডীবের থেকে নিক্ষিপ্ত তীর দিয়ে তোমার পুত্রদের হত্যাকারীর মস্তক ছেদন করে আমি তোমাকে তা উপহার দেব। যে শত্রু গৃহে আগুন লাগায়, বিষ প্রদান করে, ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে, ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে অথবা ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে এবং পত্নীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, তাকে বলা হয় আক্রমণকারী। এই ধরনের আক্রমণকারী যদি ব্রাহ্মণও হয় তাহলে সর্ব অবস্থাতেই তাকে দণ্ড দান করা বিধেয়। এই কারণে অর্জুন তাকে দণ্ড দান করতে সম্মত হয়েছিলেন। অশ্বত্থামা দূর থেকে অর্জুনকে প্রচণ্ড বেগে তার দিকে আসতে দেখে জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করে। তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শ পূর্বক আচমন করে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করল। তার ফলে এক প্রচণ্ড তেজরাশি সর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন; হে কৃষ্ণ, তুমি সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পার। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তা উপলব্ধি করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অর্জুনের উক্তি সর্বতোভাবে প্রামাণিক। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং তিনি বিশেষ করে ভক্তদের অভয় দানকারী। অর্জুন বলেন, হে দেবতাদের দেবতা, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে? তা আসছে কোথা থেকে? আমি বুঝতে পারছি না। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন এটা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার কর্ম, সে ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। দ্রোণাচার্যের পুত্র সেই অস্ত্র সংবরণ করার কৌশল জানত না এবং তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর অস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করতে, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের তেজপুঞ্জের সংঘর্ষের ফলে সূর্যমণ্ডলের মতো এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড নভোমণ্ডল এবং সমস্ত গ্রহগুলি আচ্ছাদিত করেছিল। ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রলয়কালীন সংবর্তক আগুনের কথা ভাবতে লাগল। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল এই পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন চাইলেন যে দ্রৌণী এবং অর্জুন উভয়ের অস্ত্র দুটিই সংবরণ করা হোক, তখন অর্জুন তৎক্ষণাৎ তা সম্পাদন করেছিলেন। অর্জুন ক্ষিপ্রভাবে অশ্বত্থামাকে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। অর্জুন বিবেচনা করেছিলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র যদিও ছিল কুলাঙ্গার এবং যদিও সে অনর্থক নানা রকম নৃশংস কর্ম করেছিল। কিন্তু তবুও গুরুদেবের পুত্র বলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য বাহ্যিকভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। অশ্বত্থামার আবার স্বয়ং নিন্দা করেছিলেন এবং অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেছিলেন। তিনি তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের পুত্র বা আচার্যের পুত্রের মতো আচরণ করেননি। কিন্তু পুত্রশোকে শোকমগ্না দ্রৌপদীর কাছে যখন অশ্বত্থামাকে নিয়ে আসা হলো, তখন দ্রৌপদী তাঁকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছিল তাঁর স্ত্রীসুলভ স্বভাবের প্রকাশ। দ্রৌপদী অর্জুনকে যুক্তি দেখালেন দ্রোণাচার্যের কৃপায় আপনি সমস্ত অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছেন। তাই দ্রোণাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে অনুরোধ করেছিলেন। দ্রৌপদী আরও যুক্তি দেখালেন, পুত্র বর্তমান থাকলে পতিহীনা স্ত্রী কেবল নামে মাত্রই বিধবা। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই অশ্বত্থামা ছিল দ্রোণাচার্যের প্রতিনিধি, এবং তাই অশ্বত্থামাকে হত্যা করা হলে তা দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার মতোই হতো। দ্রৌপদীর এই উক্তি সব রকমের প্রবঞ্চনারহিত, কেন না তাঁর এই উক্তি যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দৃষ্টিতে সমতা ছিল, কেন না দ্রৌপদী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি বলেছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর নিজের পুত্রশোকে শোকার্ত ছিলেন, এবং তাই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে অশ্বত্থামার মৃত্যু হলে কৃপী কি রকম বেদনা অনুভব করবে এবং তাঁর আচরণ ছিল মহৎ, কেন না তিনি এক মহান পরিবারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। ভীম ছাড়া অন্য পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই প্রস্তাবে এক মত প্রকাশ করলেন। ভীম বললেন, যে জঘন্য দুর্বৃত্তটি নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছে, তাকে বধ করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ঠিক সেই সময় অর্জুন ভগবানের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তাঁর তরবারি দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার কেশ রাশি এবং মণি ছেদন করলেন।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

১২৫তম প্রভুপাদ জন্ম বার্ষিকীতে অকল্যাণ্ডে হরিনাম সংকীর্তন

এই বছর ইসকন তাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী যিনি কোলকাতায় ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার সম্মানার্থে সমগ্র বৎসর জুড়েই পালন করে চলেছে।

শনিবার ২১শে আগষ্ট, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব দিবস ৩১শে আগষ্টের দশ দিন পূর্বে ইসকন অকল্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ডের প্রচার বিভাগের ভক্তরা অকল্যাণ্ড শহরতলীর বিভিন্ন জায়গাতে হরিনাম সংকীর্তন সংগঠিত করেন এমনকি নগরের মূল কেন্দ্রস্থল কুইন স্ট্রিটেও তা পালন করা হয়।

২১শে আগষ্ট উৎসব শুরু হলো নব বর্সানা মন্দিরে দিব্য নাম জপের মাধ্যমে। প্রাতরাশ প্রসাদের পর চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের দল বাস সহযোগে অকল্যাণ্ডের শহরতলীর বিভিন্ন জায়গাতে হরিনাম সংকীর্তন করে এবং একটি পঞ্চম দল কুইন স্ট্রীটে জপ করে।

হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা সবজি, ভাত, হালুয়া এবং প্যাকেটজাত মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করে।

শহরতলী থেকে ফিরে সমস্ত দল মহাহরিনাম সংকীর্তনের জন্য দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ কুইন স্ট্রীটে একত্রিত হন। সমগ্র দলটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে কুইন স্ট্রীটের দুই পাশ দিয়ে হরিনাম করতে করতে অগ্রসর হয় এবং হোর্যাফে যেটি কাফে, রেঁস্তোরা, বোটিং, পাব এবং ক্লাব ইত্যাদির মূল কেন্দ্র সেখানে মিলিত হয়ে হরিনাম করে।

ইতিমধ্যেই অকল্যাণ্ডের ইসকন ভক্তরা অকল্যাণ্ড কাউন্সিলের নিকট একটি আবেদন করেছে যাতে তারা শুক্রবার সন্ধ্যায় কুইন স্ট্রীটে একটি রথযাত্রার অনুমতি প্রদান করে যেটি ১২৫তম বর্ষ পালনের একটি অঙ্গ। এছাড়াও তারা একটি জুম রিডিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত, প্রভুপাদের জীবনী তার আবির্ভাব দিবস পর্যন্ত পড়ানো হয়। প্রত্যেককে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার ওপর ধ্যান ও মন্থন করা হয়।

ফ্লোরিডার সমুদ্র সৈকতে ভগবান জগন্নাথদেব

২৬শে জুন প্রায় পাঁচশোরও বেশী ভক্ত আলাচুয়া এবং অন্যান্য ইসকন সম্প্রদায় থেকে ডেটোনা সমুদ্র সৈকতে যে স্থানটি মধ্য ফ্লোরিডার একটি নৈসর্গিক দর্শনীয় স্থান, রথযাত্রা উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে সমবেত হয়েছিলেন, এটি একটি দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান ছিল।

কোভিড-১৯ অতিমারীতে সমগ্র বিশ্বের বহু উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় বিলম্বিত হয়েছে, না হলে বহু কাল যাবৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

কোনও বিশেষ কারণে, জগন্নাথ স্বামী, জগতপতি, যিনি বর্ণাঢ্য রথে তাঁর ভ্রাতা বলদেব ও ভগ্নী সুভদ্রা মহারানী সহ ফ্লোরিডা রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ প্রসন্ন হন। প্রকৃতপক্ষে বিগত দুই দশক যাবৎ তিনি ফ্লোরিডাতে প্রায় ২০০ বারেরও বেশী বিভিন্ন উৎসবে ও শোভাযাত্রায় মন্দিরের বাইরে এসেছেন। তিনি স্বর্ণময় সমুদ্র সৈকত এবং হাস্যোজ্জ্বল স্থানীয় মানুষদের খুব ভালবাসেন।

এবারেও ডেটোনা সমুদ্র সৈকত তাদের দ্বারা রথের দড়িটানা বালুকাবেলাতে পদচারণা এবং বর্ণময় শোভাযাত্রাতে সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। মনোমুগ্ধকারী কীর্তনকারী আলাচুয়ার ভক্তগণ সৈকতে কোন একজনকেও মোহিত করতে ছাড়েনি।

রথযাত্রা প্রধান প্রবন্ধক ভদ্রদাসের বক্তব্য অনুযায়ী, ভগবান জগন্নাথদেবকে পুনরায় দর্শন করার আকাঙ্ক্ষাকারী ভক্তগণের আকুলতার কারণেই এই উৎসবটি বিপুলভাবে সাফল্য পায়।

ভদ্র বলেন, 'প্রত্যেকেই আমাদের রথযাত্রা ভালবাসেন'। ''তারা ভগবানের নাম শ্রবণ করেন, সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তারা সমস্ত ভক্তদের খুশি, তাদের উৎসাহ, তাদের নৃত্যকুশলতা এবং সুন্দর সুন্দর পোশাক দেখে খুব উৎসাহিত হন। এই সমস্তই তাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তাই তারা এটি খুব পছন্দ করেন। এটিই আমাদের উৎসবের সৌন্দর্য। উৎসবের সমাপ্তি দিনে সকলেই সন্তরণে যোগগান করেন।''

১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার ফ্লোরিডায় ক্লিয়ার ওয়াটার সমুদ্র সৈকতে পরবর্তী রথযাত্রা সংগঠিত হয়। এটি মধুহা দাসের নেতৃত্বে ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় শোভাযাত্রা সহকারে হয় যেখানে মঞ্চ অনুষ্ঠানে প্রদর্শন, চিত্রাবলী এবং অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানও সংগঠিত হয়।

ইসকন এবং জি.ই.ভি ভগবদ্গীতার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার মূল্যবোধ প্রসারে যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশ প্রকল্পের সমর্থন লাভ করল

সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসকন মন্দিরসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হল যাতে তারা তাদের স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত স্কুলে গিয়ে ভ্যালু এডুকেশন অলিমপিয়াড ২০২১শে স্কুলের ছাত্রদের নামাঙ্কনে অনুরোধ করেন।

এই বছর এই জনপ্রিয় অলিমপিয়াড ইসকন ভারতবর্ষে শুরু করেছে যা অনলাইনের মাধ্যমে হবে এবং বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে সেখানে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তাগুলির ওপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হবে। সেখানে ধারাবাহিকভাবে পাঠ নির্দেশ, সেমিনার, ওয়ার্ক কাজ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পয়লা আগষ্ট থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং শেষে ১৭ই অক্টোবর পরীক্ষা হবে। এই অলিমপিয়াড ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছাত্রদের শিক্ষা দেবে এবং সেখানে তারা ভগবদ্গীতার শিক্ষা থেকে কিভাবে পরিবেশ বান্ধব সমৃদ্ধি লাভ করা যায় তার শিক্ষা এবং চেতনা গ্রহণ করবে। এই অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে গোবর্ধন ইকো ভিলেজ ও ইসকন, ফ্রেন্স ফর আর্থ কাউন্সেলার এর ছত্রছায়াতে যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশ প্রকল্পের (ইউ.এন.ই.পি) সহযোগিতায় উপস্থাপিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই অনেক ইসকন মন্দির যোগদান করেছে যেগুলি হলো পাঞ্জাবীবাগ দিল্লী যারা অলিমপিয়াডের আয়োজক এছাড়া পুনা, ব্যাঙ্গালোর, শ্রীরঙ্গম, মিরাট এবং নাগপুর। আন্তর্জাতিকভাবে নিয়োজিত ইসকন মন্দিরগুলি হলো কানাডায় ভ্যানকুভার, অস্ট্রেলিয়াতে সিডনী এবং ব্রিসবেন; এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মালয়েশীয় মন্দিরগুলিও আছে।

প্রকল্প প্রধান ও ইসকন পাঞ্জাবীবাগের উপপতি বোর্ডের সদস্য করুনা চন্দ্র দাস বলেন, ''আমরা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিশুদের পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা দিচ্ছি, এই কারণের জন্যই এই অনুষ্ঠানটিকে স্বাগতম জানিয়েছি।''

তিনি আরও বলেন, লোকে সর্বদাই জিজ্ঞাসা করে কিভাবে গীতা আমাদের ব্যবহারিক সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটি হলো এই সব প্রশ্নের উত্তর। আবহাওয়া পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের মানুষকে প্রভাবিত করছে। তাই আমরা ভগবদ্গীতা শিক্ষার সমাধানে ব্যবহার করছি।

নিউজার্সির পারসিপানিতে প্রথম রথযাত্রা উৎসব ও নতুন মন্দির নির্মাণ

নিউজার্সি, পারসিপানি প্রথম বার্ষিক রথযাত্রা উৎসব এই গ্রীষ্মকালে ১১ই জুলাই ২০২১শে পালিত হলো।

উজ্জ্বল মুখমণ্ডল বিভিন্ন রঙিন পোষাকে সজ্জিত প্রায় ১৫০০র ও বেশী ভক্ত গীতনৃত্য সহযোগে পরম উৎসাহের সাথে সুসজ্জিত রথে স্থাপিত ভগবান জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানী সহ রথযাত্রা ধর্মমন্দির থেকে শুরু করেন এবং নবনির্মিত বিখ্যাত ইসকন পারসিপানি মন্দির নির্মাণ প্রাঙ্গনে শেষ হয় যেখানে শোভাযাত্রাটিতে উচ্চস্বরে কীর্তন সহযোগে শেষ

হয়।

মহানাগরিক অতি উৎসাহের সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে যথা প্রারম্ভিক নারিকেল আরতি এবং তার পর ভগবানের রথের সম্মুখে রাস্তার ওপর ঝাড়ু দান সেবা যেটি প্রথাগত ভাবে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে রাজা সম্পন্ন করে থাকেন, তিনি সম্পাদন করেন।

পারসিপানি ব্রজধাম মন্দিরের সহযোগী ভক্তগণ এক অনন্য রথযাত্রা পথ তালিকা তৈরী করেন যেখানে, রথযাত্রা সৌন্দর্যময় রাস্তা, কৃষ্ণভক্তদের গৃহ সংলগ্ন স্থান দিয়ে ভ্রমণ করেছিল । ভক্তরা তাদের গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আরতির থালি সংযোগে ভগবান জগন্নাথদেবের আরতি করেন।

শোভাযাত্রার শেষে, মন্দির নির্মাণ ক্ষেত্রের সংলগ্ন রাস্তায় অবস্থিত পাল সেন্টারের বিশাল হলঘরে উৎসবের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। সেখানে ভক্তরা বর্ণাঢ্য ভক্তি নৃত্য প্রদর্শন করেন যাতে বিখ্যাত কলাশ্রী স্কুল অব ড্যান্স এবং ব্রজধাম মন্দিরের প্রচারক ভক্তগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শেষে এক সুস্বাদু প্রসাদম মহাভোজ (১২০০রও বেশী ভোজন থালি) সমস্ত অংশ গ্রহণকারীকে নিঃশুল্ক বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে নির্মিয়মান নতুন মন্দিরটি তার ইস্পাত নির্মিত চূড়াটির কারণে বহু দূর থেকে দৃশ্যমান। মন্দির কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে নতুন মন্দিরে স্থানান্তরের ব্যাপারে আশাবাদী।

ফ্লোরিডা, জেনসিভিলের ভক্তগণ সেখানে প্রভুপাদের আগমনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করল

গত সপ্তাহন্তে ফ্লোরিডা জেনসিভিলের ভক্তগণ ১৯৭১ সালে শ্রীল প্রভুপাদের জেনসিভিলের প্রথম পরিদর্শনের ৫০ বছর পূর্তি এবং তার ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী এক ত্রিদিবসিয় উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করল। অনুষ্ঠানটি ২৯শে জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত পালিত হয় যেখানে অনেক পথপ্রদর্শক ভক্তরা তাদের বক্তব্য রাখেন এবং জেনসিভিলের মহানাগরিক ও ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি প্রশংসা করেন।

২৯শে জুলাই, শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম আগমনের দিনে আমেরিকার ইউ এফ প্লাজাতে তার আগমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বর্তমান অনুষ্ঠানটি প্লাজার বাইরের মঞ্চে সকাল ৬.৪৫ মিনিটে কীর্তন সহযোগে শুরু হয় যা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহের উপস্থিতিতে মহিমান্বিত হয়েছিল। পথপ্রদর্শক হৃদয়ানন্দ দাস গোস্বামী, অমরেন্দ্র দাস, বীরকৃষ্ণ গোস্বামী ও ধর্ম দাস শ্রীল প্রভুপাদের পরিদর্শন এবং বিখ্যাত কৃষ্ণ লাঞ্চ প্রোগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিগতভাবে সেই বছর ২৯শে জুলাই প্লাজাতে তার আগমন বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসাদ বিতরণ এবং কীর্তন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন এই পদপ্রদর্শক ভক্তগণ তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারপর জেনসিভিলের মহানাগরিক লরেন পো তাঁর উদ্দেশ্যটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থান অবশেষে দখল মুক্ত

এটি ১২৫তম বছর যখন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ কোলকাতার টালিগঞ্জে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ২০২১ সালে ইসকন কোলকাতা সেই গাছটির নীচে অবস্থিত চারটি ছোট ছোট কক্ষের অধিগ্রহণ নেয়। এটি শ্রীমদ রাধানাথ স্বামী মহারাজের বদান্যতার ফলেই সম্ভব হয়েছে যিনি ঐ চারটি কক্ষে বসবাসকারীদের স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেন। সমগ্র সম্পত্তিটি সাড়ে চার কাঠার মতো যা প্রায় সতেরোজন ভাড়াটিয়া দখল করে রেখেছিল।

সম্প্রতিকালে ইসকন কোলকাতা মহাপ্রবন্ধক রাধারমন দাস, সহযোগী দাউজি কৃপা প্রভু এবং অন্যান্য মন্দির ও ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় ঐ সতেরোটি ভাড়াটিয়াকে স্থানান্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ঐ সতেরোটি ঘর ভাঙা হয়েছে এবং বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থান দখল মুক্ত।

ভক্তরা প্রথম দফার কাজে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানটির চতুর্দিকে একটি ২৬০ ফিট প্রাচীর নির্মাণ করছে যাতে ভূমিটি

সুরক্ষিত থাকে। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম জয়পুরে সাদা মাক্রানা মার্বেল দ্বারা নির্মাণ করা হচ্ছে এবং চারটি কৌনিক প্রস্তর যেগুলি ৩১শে আগষ্ট স্থাপন করা হয়। প্রথম দফাতে মেঝে প্রস্তুতি করতে ৩১শে আগষ্ট ২০২১ সালে সমাপ্ত হবে। যার জন্য প্রত্যহ ২৪ ঘন্টা নিরন্তর কাজ চলে।

দ্বিতীয় দফায় কাজ পরে শুরু হবে। দ্বিতীয় দফায় ভক্তদের পরিকল্পনা হলো ইসকন বৃন্দাবনের মতো শ্রীল প্রভুপাদের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শ্রীবিগ্রহ থাকবে।

দ্বিতীয় দফাতে শ্রীল প্রভুপাদ জন্মস্থানের চর্তুদিকে প্রায় ২ একর জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থার ওপর বিশেষ মনোনিবেশ করা হবে।

রাধারমন দাস বলেন, ''যখন থেকে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে রোজই কিছু না কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে। যখন এই ৮০ বছরের পুরাতন নির্মাণটি যেখানে লোকজন বাস করতো এবং তাদের ঘরের মেঝে ভেঙে ফেলা হলো এবং প্রাচীর নির্মাণের জন্য খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হলো তখন সেখানের মাটি দেখে আমরা চমকিত হয়ে গেলাম। শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানের মাটি সেই মাটি যা শুধুমাত্র ব্রজধামে (বৃন্দাবন মথুরাতে) পাওয়া যায়। এটি স্বর্ণাভ এবং রেণুর মতো নরম। এই ধরনের মাটি পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। সেই স্থানের লোকজন এবং প্রতিবেশীগণও চমকিত যে এই ধরনের মাটি সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। কাঁঠাল গাছের নিচের মাটির স্তরটি সংরক্ষণ করছি যাতে ভক্তরা এতে গড়াগড়ি দিতে পারেন। এই সেই মাটি যা অভয় চরণের ছোট্ট ছোট্ট পাদপদ্ম স্পর্শ করেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম স্থানের উচ্চতাও রাস্তার থেকে তিন ফিট বাড়ানো হবে। যার জন্য শ্রী যমুনা মাতা ও শ্রী গঙ্গা মাতার সাদা বালি সংগ্রহ করা হয়েছে । এটি শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানের মাটির সঙ্গে মেশানো হবে ।''

মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আধিকারীকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত দস্তাবেজ যেন তৈরী থাকে যাতে সরকার ৩১শে আগষ্ট ২০২১ এর পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানের দস্তাবেজ ইসকনের হাতে সমর্পন করতে পারেন। এই জমিটি সরকারের এবং সরকার এই জমিটি ইসকনকে উপহার দেবেন (যেহেতু ১৭ + ৩ পরিবারের স্থানান্তরণ সম্পূর্ণ হয়েছে)

৩১শে আগষ্ট ২০২১ (ভারতীয় সময় দুপুর তিনটে থেকে) ইসকন কোলকাতা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থান থেকে এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আমাদের বরিষ্ঠ মহারাজগণ তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ভারতীয় সময় বিকাল চারটে থেকে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপদ্ম স্থাপনের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ইসকন লস এঞ্জেলেস উৎসবের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি

শ্রীশ্রীরুক্মিনী দ্বারকাধীশ স্থাপনা এবং তাঁদের অর্চনা শুরুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি স্মরণ উৎসব পালন করা হয়। সেই সময়কার প্রারম্ভিক বিশেষ অতিথি বক্তাগণ তাদের বক্তব্য রাখেন এবং বিশেষ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পূজা এবং কীর্তন এই দুই দিন ব্যাপী উৎসবে সম্পন্ন করা হলো।

এই উৎসবে ২৮-২৯শে আগষ্ট এবং জন্মাষ্টমীর দিনে পালিত হয়। কারণ এই শ্রীবিগ্রহ আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আগষ্ট মাসেই স্থাপিত হয়েছিল। ৩১শে আগষ্ট সমস্ত দিবসব্যাপী এই উৎসব পালন করা হয় যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাস পূজা, শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্রবণ এবং তাঁর বরিষ্ঠ শিষ্যবর্গের দ্বারা নব দ্বারকা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই দুই দিনই ভগবদ্গীতা প্রদর্শনীশালা এবং শ্রীল প্রভুপাদ গৃহ দর্শন খোলা থাকে।

নির্ধারিত অতিথি বক্তাগণ ছিলেন – বদ্রীনারায়ণ মহারাজ (যিনি দীর্ঘ সময়ের নব দ্বারকার প্রধান পথপ্রদর্শক), শিলাবতী (প্রাক্তনপূজারী এবং সাধনকারী), কর্ণধার দাস (লস এঞ্জেলেসের মূল জিবিসি) এবং রামেশ্বর দাস (নব দ্বারকা এবং ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রাক্তন নির্দেশক)। অমল কীর্তন দাস এবং নব দ্বারকার স্থানীয় শিল্পীগণ দুই দিনব্যাপী কীর্তন সেবা সম্পাদন করেন।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

৯এর পাতার পর

''সমাজে মানুষদের মধ্যে যারা জীবনের উৎস শ্রীহরিকে ভজনা না করে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের অহংকারে তাঁর ভজনে অবজ্ঞা করে, তারা স্থানভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।'' (ভাগবত ১১।৫।৩)

'স্থানভ্রষ্ট' বলতে বুঝায়, মনুষ্য জন্ম পেয়ে যা করা উচিত বা যা করার সুযোগ আছে, সেই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। 'অধঃপতিত হয়' বলতে বুঝায়, তামিশ্র প্রভৃতি নরকে পতিত হতে হবে। আবার পৃথিবীতে থাকার সুযোগ পেলেও মনুষ্য জীবন না হয়ে পশুপাখী কীটপতঙ্গ গাছপালা প্রভৃতি জন্ম নিয়ে থাকতে হবে। আর যে জন্মে থাকো না কেন উদ্বেগের শেষ নেই। যেহেতু এই জড়জগত উৎকণ্ঠাময়। সেই জন্যে বলা হয় এই সংসারে তারাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান যারা হরিভজন করছেন। যজন্তি হি সুমেধসঃ।

প্রশ্নোত্তরে ঃ - **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

ব্রহ্মসংহিতা

আনন্দ চিন্ময় রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪২।।

আনন্দ---আনন্দময়; *চিন্ময়*---জ্ঞানময়; *রস*—রসের; *আত্মতয়া*—বস্তুর অস্তিত্বের কারণে; *মনঃসু*—শুদ্ধ হৃদয়ে; *যঃ*—যিনিং; *প্রাণিনাম্*—জীবদের; *প্রতিফলন্* — প্রতিবিম্বরূপে প্রতিফলিত হয়ে; *স্মরতাম্ উপেত্য*--- কন্দর্প স্বরূপতা প্রকাশ করে; *লীলায়িতেন*---নিজ লীলা বিলাস দ্বারা; *ভুবনানি*—ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে; *জয়তি*—জয় করছেন; *অজস্রং*---নিরন্তর; *গোবিন্দম্*- -- গোবিন্দকে; *আদি-পুরুষম্*---আদি পুরুষকে; *তম্*— সেই; অহম্—আমি; *ভজামি*-ভজনা করি।

যিনি আনন্দ চিন্ময় রস স্বরূপে প্রাণীদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে নিজলীলা বিলাস দ্বারা নিরন্তর ভুবনবিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আনন্দ চিন্ময় রসাত্মতয়া মনঃসু—আনন্দময় চিন্ময় রস স্বরূপে বিভাবিত হৃদয় মধ্যে। উজ্জ্বল রসময় কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা ধাম ভক্তহৃদয়ে স্ফুরিত হয়।

যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতাম্ উপেত্য—যিনি মন্মথ মূর্তিরূপে স্মরণকারী প্রাণীদের হৃদয়ে প্রতিফলিত বা উদিত হন। মন্মথ বা মদনদেব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে মোহিত করেন। সেই মদনদেব যাঁর রূপ দর্শন করে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তিনি হলেন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। সেই মোহন মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা যাঁরা স্মরণ করেন, তাঁরাই যথার্থ স্মরণকারী। তাঁদের চিত্তেই ধাম ও লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ উদিত হন।

লীলায়িতেন ভুবনানি জয়তি অজস্রং—শ্রীকৃষ্ণ নিজলীলা বিলাস দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে নিরন্তর জয় করছেন। ভক্তহৃদয়েই ধাম ও লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ উদিত হন। সেই উদিত লীলা জড়জগতসমূহের সমস্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে সর্বতোভাবে জয় করে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২৪) বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক, সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক এবং মহারসের আধার। নিজ শক্তির দ্বারা তিনি অন্য সমস্ত রকমের আনন্দের কথা ভুলিয়ে দেন। তাঁর অলৌকিক শক্তিগুণে ও কৃপার প্রভাবে ভক্তের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি সুখের বাসনা দূর হয়ে যায়। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তার আর শাস্ত্রযুক্তি কিংবা সিদ্ধান্তের বিচার থাকে না। ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও কারুণ্য আদি গুণে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ পরিপূর্ণ। তাঁর ভক্তবৎসলতা এতই উদার যে তিনি ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত সমর্পণ করেন। তাঁর রূপ, রস, সৌরভ আদি বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ভক্তের মন আকর্ষণ করে। যেমন, তাঁর চরণপদ্মে অর্পিত তুলসী সৌরভ চতুষ্কুমারের মন হরণ করে। তাঁর লীলা শ্রবণ শুকদেব গোস্বামীর, তাঁর অঙ্গের রূপ ব্রজ গোপীদের, তাঁর রূপ গুণ কথা শ্রবণ রুক্মিনীদেবীর, তাঁর বংশীধ্বনি লক্ষ্মীদেবীর মন হরণ করে। শ্রীকৃষ্ণের কোনও গুণে যখন ভক্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন চারি পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন এবং মোক্ষ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়া—এই সবই ভক্তের কাছে ফালতু বিষয় রূপে গণ্য হয়।

গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তম্ অহং ভজামি—আনন্দ চিন্ময় রস লীলাময় আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গা

প্রেমাঞ্জন দাস

ব্রহ্ম সংহিতায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বলেছেন ঃ

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (৪৪)

আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি যাঁর শক্তিকে বলা হয় দুর্গা। এই দুর্গা হচ্ছেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনকারী এক শক্তি যিনি সমস্ত ভুবনকে ভরণ পোষণ করেন। কিন্তু তিনি ঠিক ছায়ার মতো শুধু গোবিন্দের ইচ্ছা অনুরূপ কার্যই সম্পাদন করেন।

তার আগের শ্লোকটিতে (৪৩) বলা হয়েছে যে, গোবিন্দের নিজ ধামের নাম হচ্ছে গোলোক। গোলোকের তলে রয়েছে হরি ধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ। তার তলে রয়েছে মহেশ ধাম অর্থাৎ ভগবান শিবের নিবাস। আর তার তলে রয়েছে দেবী দুর্গার ধাম অর্থাৎ এই জড় জগত। এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধামে যিনি নিজ শক্তি এবং ক্ষমতা বন্টন করে প্রদান করেছেন, আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি।

এইভাবে শক্তি বন্টন করে বিভিন্ন দেবদেবীকে প্রদান করার ফলে ভগবান শ্রীগোবিন্দ কিন্তু শক্তিহীন হয়ে যান না। শ্রীঈশোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

ওঁ পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। (আবাহন)

ভগবান পূর্ণ। তাঁর সৃষ্টি পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণই উদ্ভূত হয়। পূর্ণ থেকে পূর্ণ আদায় করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ভগবান যদিও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি দুর্গা প্রমুখ দেবদেবী নিযুক্ত করেছেন, এবং তাদেরকে অনন্ত পরিমাণ শক্তি প্রদান করেছেন, তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীগোবিন্দের শক্তি কিন্তু পূর্ণ রয়ে গেছে। এক বিন্দু শক্তিও কমে যায়নি।

বিভিন্ন কারণে ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তিকে দুর্গা বলা হয়। দুঃ মানে কষ্টসাধ্য। গ মানে গমন। যেখানে গমন করা দুঃসাধ্য, তাকেই বলে দুর্গ। এজন্য জেলখানাকে দুর্গ বলা হয়, এবার এই দুর্গকে স্ত্রীলিঙ্গে বলা হয় দুর্গা। জেলখানার চারপাশে বিশাল প্রাচীর দেওয়া থাকে। যার ফলে এই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কোনও মানুষ বা প্রাণী সহজে এই দুর্গে প্রবেশ বা বাইরে বেরুতে পারে না। ঠিক তেমনি সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত অতি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এটি হচ্ছে ভগবানের দ্বারা নির্মিত জেলখানা তথা দুর্গ। আর এই দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলে দুর্গা।

দেবী দুর্গার দশ হাতে ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্র রয়েছে। ত্রি মানে তিন এবং শূল মানে ব্যথা বা যন্ত্রণা। এই তিন প্রকার যন্ত্রণা হল আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ এবং আধিভৌতিক দুঃখ। দেহ ও মন সংক্রান্ত দুঃখকে বলে আধ্যাত্মিক। দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ। আর মশা মাছি, কীট পতঙ্গ, সাপ প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা প্রদত্ত দুঃখকে বলে আধিভৌতিক দুঃখ।

আদি দুর্গার স্বামী হচ্ছেন সদাশিব, যাকে মহাবিষ্ণুও বলা হয়। সদাশিব যখন দুর্গার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই শুরু হয় জড় জগতের সৃষ্টি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ গ্রন্থেও এই দুর্গাদেবী সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থের ১০ম স্কন্ধের ৮৭নং অধ্যায়ের ২৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

হে গোবিন্দ, যদিও আপনার কোনও জড় ইন্দ্রিয় নেই,

তবুও আপনি হলেন প্রতিটি জীবের ইন্দ্রিয় শক্তির স্বয়ং উদ্ভাসিত শক্তি প্রদাতা। সমস্ত দেবতাগণ এবং স্বয়ং দুর্গাদেবী (অজয়া) আপনাকে সম্মান করেন। আবার তাঁদের উপাসনাকারীদের প্রদত্ত উপহারও তারা উপভোগ করেন। ঠিক যেমন অধীনস্থ করদানকারী মিত্র রাজারা রাজাধিরাজকে কর প্রদান করেও প্রজাদের দ্বারা প্রদত্ত কর তাঁরা নিজেরাও ভোগ করেন। এই ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাগণ আপনার ভয়ে বিশ্বস্ত ভাবে তাঁদের প্রতি আপনার দ্বারা প্রদত্ত সেবার দায়িত্বভার পালন করেন।

ব্রহ্ম সংহিতার ৪৩ এবং ৪৪ নম্বর শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, এই জড় জগতকে দেবীধাম বলা হয়েছে এবং দেবী দুর্গা শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ ছায়া শক্তি রূপে কার্য করেন। তার মানে তিনি একজন পরমা বৈষ্ণবী। তাই এই সংসারে যারা শ্রীগোবিন্দের অনুগত, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত, শ্রীদুর্গার ত্রিশূল তাদের জন্য নয়।

শক্তি উপাসকেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। কিন্তু তারা ভুলে যান যে তিনি শ্রীগোবিন্দের ছায়া শক্তি এবং শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছার বাইরে তিনি কিছু করেন না। দেবী উপাসকেরা মায়ের কাছে ধন দাও,

জন দাও, রূপবতী ভার্যা দাও—এই ভাবে অসংখ্য জড় জাগতিক ক্ষণস্থায়ী বর প্রার্থনা করে। অন্য দিকে কৃষ্ণভক্তরা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে যে আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী স্ত্রী চাই না। কৃষ্ণভক্তের একমাত্র কাম্য হচ্ছে অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেম, যা জীবনের নিত্য সম্পদ।

বৃন্দাবনের গোপীরাও দেবী দুর্গাকে কাত্যায়নী রূপে আরাধনা করেছিলেন। কিন্তু তারা দুর্গার কাছে কৃষ্ণকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাই আমরাও গোপীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুর্গার কাছে শুধু কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা করব। তাহলেই দুর্গা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন এবং আমাদেরকে কৃষ্ণভক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। অন্যথায় তিনি মহামায়ারূপে জীবের জড় বাসনা পূর্ণ করার পাশাপাশি তাঁর ত্রিশূলের আঘাতও চালিয়ে যাবেন।

এই আদি দুর্গারই অংশ বিস্তার হচ্ছেন শিবপত্নী পার্বতী। মায়াপুরের সন্নিকটে সীমন্ত দ্বীপে এই পার্বতী দেবী এসে তপস্যা করেছিলেন মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপা লাভ করার জন্য। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের মধ্যে সীমন্ত দ্বীপ অন্যতম এবং তার সীমানা অন্তর্দ্বীপ তথা মায়াপুরের সীমানা ঘেঁষে। এই সীমন্ত দ্বীপ হচ্ছে নববিধা ভক্তির অন্যতম, হরিকথা শ্রবণের জন্য এক দিব্য স্থান। কি করে এই দ্বীপের নাম সীমন্ত হল, সেই কাহিনী নিম্নে বর্ণিত হল। মহাপ্রভুর লীলা বিলাসের সময় এই দ্বীপটি সিমুলিয়া নামেও পরিচিত ছিল। দেবী দুর্গা তথা পার্বতীর একটি বিশেষ লীলার কারণে এই দ্বীপের নাম হয় সীমন্ত। নিম্নে বর্ণিত এই লীলা থেকে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারব যে দুর্গা দেবী হচ্ছেন এক পরমা বৈষ্ণবী।

একদিন দেবী দুর্গা কৈলাসে তার স্বামী শিবের সঙ্গে বসেছিলেন। দেবী দেখলেন যে তার স্বামী অকস্মাৎ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ নাম কীর্তন করতে করতে উদণ্ড নৃত্য শুরু করেছেন। স্বামীর দিব্য ভাব ও উন্মাদনা লক্ষ্য করে দুর্গা দেবী স্বামীর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কে এই গৌরাঙ্গ? শিব তখন পার্বতীকে সব খুলে বললেন যে এই গৌরাঙ্গ হলেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যিনি কলিযুগের সমস্ত অধঃপতিত জীবদেরকে উদ্ধার করার জন্য নবদ্বীপে মায়াপুরে অবতীর্ণ হবেন এবং আপামর জন সাধারণকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে কৃপা বিতরণ করবেন। তিনি আরও ব্যাখ্যা করলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ এই হরিনাম প্রচারের মাধ্যমে জগদ্‌বাসীকে কৃষ্ণপ্রেমের এক মহা আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত করবেন।

স্বামীর মুখে এই দিব্য বর্ণনা শ্রবণ করে পার্বতী দেবী তথা দুর্গা এই স্থানে এলেন এবং ভগবান গৌরাঙ্গকে প্রসন্ন করার মানসে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। সুবর্ণ বর্ণ গৌরাঙ্গ পার্বতীকে দর্শন দান করে তাঁর তপস্যার কারণ জানতে চাইলেন। পার্বতী দেবী দুঃখ করে বললেন যে তিনি কখনো ভগবানের লীলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং সর্বদাই তার দিব্য সঙ্গ থেকে বঞ্চিত।

এই কথা শুনে মহাপ্রভু দুর্গাকে সান্ত্বনা প্রদন করে কথা দিলেন যে এই গৌরাঙ্গ লীলায় তাঁকে বিশেষ সেবার সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি প্রৌঢ়া মায়া রূপে এই নবদ্বীপ ধামের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এইভাবে কথোপকথনের সময় দেবী পার্বতী মহাপ্রভুর চরণ থেকে ধূলি নিয়ে তাঁর সিঁথিতে ধারণ করেছিলেন। সেই থেকে এই দ্বীপের নাম হয় সীমন্ত (সিঁথি শব্দের সংস্কৃত) দ্বীপ। সীমন্ত দ্বীপে দেবী দুর্গাকে বলা হয় সীমন্তিনী দেবী এবং রাজাপুরের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের পাশেই সীমন্তিনী দেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছে যেখানে দেবী দুর্গা এবং মহাপ্রভুর বিগ্রহ বিরাজ করছেন।

গরুর লেজ ধরে শ্বশুর বড়ী যাত্রা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

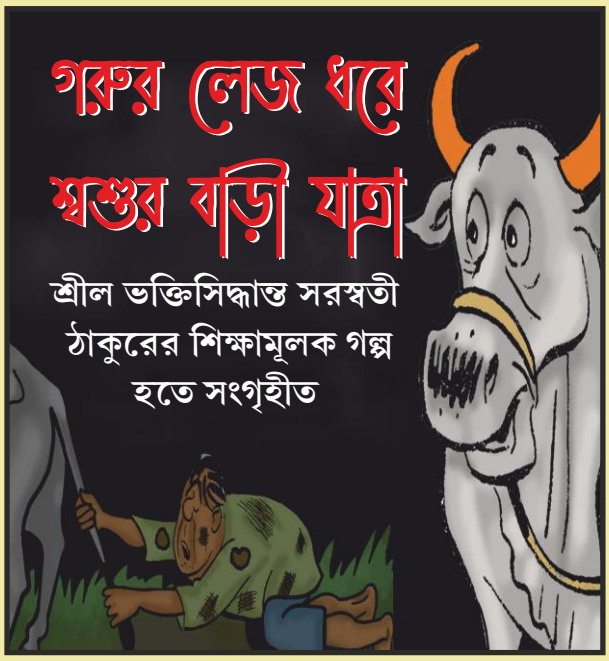

তাৎপর্যঃ

যারা প্রকৃত ও অনুমোদিত আধ্যাত্মিক গুরুর পরিবর্তে বিপরীত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তথাকথিত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাদেরকে এই অন্ধ ব্যক্তিটির ন্যায় ভয়ানক দুর্দশাগ্রস্ত হতে হয়।

যে কেউ ভগবানের চিন্ময় ধামের পথ নির্দেশ করতে পারে না এবং কোন অননুমোদিত ব্যক্তি আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারে না। সুতরাং, নিঃসংশয়ে একজন অনুমোদিত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আধ্যাত্মিক গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

কাম্যবনে রাস

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

মধ্য ভারতে পার্বত্য এলাকা
পুলিন্দরা বাস করে।
দুঃসাহস করি একদিন তারা
রাজধন লুঠ করে।।
বিন্ধ্য দেশের প্রতাপী রাজার
হইল প্রবল ক্রোধ।
দু অক্ষৌহিনী সেনা দিয়া করে
এলাকা অবরোধ।।
মরিয়া হয়ে পুলিন্দরা সবে
রাজবিরুদ্ধে যুঝে।
খড়্গ কুঠার বান ভুশুন্ডী
বহুত অস্ত্রে সাজে।।
অবশেষে তারা কংস রাজার
সাহায্য যাচ্না করে।
কংস পাঠালো প্রলম্ব নামে
মায়াবী এক অসুরে।।
চব্বিশ কিমি লম্বা শরীর
কালো মেঘের মতো।
হস্তে গদা পায়ে শিকল
দেখতে যমের মতো।।
বৃক্ষ কতক উপাড়িল সে
পর্বত কাঁপিয়ে।
রণভূমি ছাড়ি সিন্ধু রাজের
সেনা সব পলায়ে।।

প্রলম্ব এবার পুলিন্দদেরে
আনে কংসের কাছে।
ভৃত্য রূপে কিছুদিন তারা
রইল মথুরাতে।।
আত্মীয় সাথে তারপরে বাস
করিল কাম্য গিরি।
রামলীলা কথা কীর্তন করে
ভক্তিনিষ্ঠা করি।।
শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদে
পুলিন্দদের ঘরে।
লক্ষ্মীর মতো বহুত কন্যা
জন্মগ্রহণ করে।।
ঘটনা ক্রমে কন্যারা সবে
দেখয়ে গোচারণে।
অতি সুন্দর মধুর মূর্তি
যশোদা নন্দনে।।
পদ্ম নয়না কন্যারা সবে
আনদিকে না সরে।
একান্ত মনে হৃদয় ভরে
তাঁরে দর্শন করে।।
কথা কহিবার শক্তি তো নাই
রাজপুত্রের সাথে।
কৃষ্ণচরণ চিহ্নিত ধূলি
মাখয়ে বুকে মাথে।।

বিধাতার কাছে কন্যারা সবে
প্রার্থনা করে নিতি।
ভাগ্যবিধাতা! শ্রীনন্দদুলাল
হউক মোদের পতি।।
এই জগতে আমরা তো আর
কিছুই নাই চাই।
সমস্ত ব্রত তপস্যা চেষ্টা
কৃষ্ণে যাতে পাই।।
নন্দকিশোর যদি মোদের
না অঙ্গীকার করে।
তবুও মোরা রইব বেঁচে
(তাঁর) চরণ স্পর্শ তরে।।
একদিন তারা পূর্ণিমা রাতে
শুনিল বংশীধ্বনি।
দলে দলে তারা ধাঞা আসিল
হেরিতে হৃদয় মনি।।
নিমীলিত চোখে নিরালায় বসি
সুর তুলে শ্রীহরি।
অঙ্গনা সবে দাঁড়াইল ঘিরে
রইল মৌন করি।।
পদ্মনয়ন মেলি প্রভু তবে
দেখিল তা সবারে।
কহে মৃদু কণ্ঠে তোমরা কেন এ
রাতে বন মাঝারে।।
কন্যারা কহে হে গোবিন্দ
দিনরাত না মানি।
তোমার কথা ছাড়া সকল
সময় বৃথা জানি।।
সমাজ মাঝে মান মর্যাদা
কিছু মোদের নাই।
মর্যাদা আর নষ্ট করার
কি আছে বলো তাই।।
সারা জগতে আছে যত জীব
কেউ তো কারো নয়।
আজ সংগাত কাল সংঘাত
রোজ দৃষ্টান্ত হয়।।
তুমি সবার অন্তর্যামী
সবার কথা জানো।
তুমিই আর্তি হরণকারী
ভক্তে কাছে টানো।।
পতিত পাবন তুমি হে হরি
তুমি করুণাময়।
তোমার মধুর রূপের টানে
কেবা দূরে রয়।।
চাঁদনী রাতে মুরলী শুনে
ছুটে এসেছি কাছে।
পরাণ ভরে দেখব তোমায়
এই বাসনা আছে।।
মোদের এখন সরিয়ে দূরে
না কর বঞ্চনা।
মোদের দুঃখ বোঝো যদি
চলে যেতে বলো না।।
প্রার্থনা শুনি উঠিল শ্রীহরি
সুস্মিত বদনে।
স্বর্ণ কমলিনী রাসনৃত্য করে
নীল কমলের সনে।।
নিষ্কাম প্রেমে ভজিল শ্রীহরি
পূর্ব জীবনে যাঁরা।
হরি আশীর্বাদে ব্রজে গোপীরূপে
নৃত্য করয়ে তাঁরা।।

প্রকাশিত হয়েছে

কয়েক হাজার নিদারুণ প্রশ্ন এবং সহজ সুন্দর উত্তর সম্বলিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থ

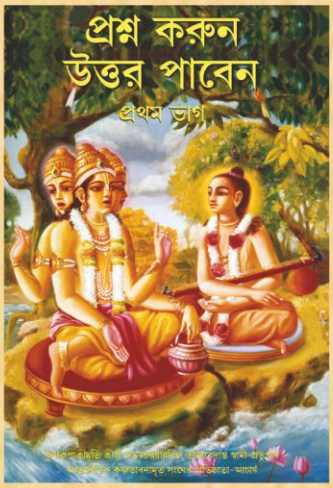

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(প্রথম ভাগ)

তাকালেই পেতে চাইবেন

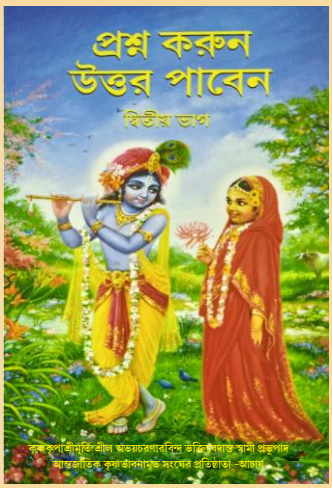

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(দ্বিতীয় ভাগ)

এই দুটি গ্রন্থে রয়েছে আপনার সত্য জিজ্ঞাসু মনের মণিকোঠায় জেগে ওঠা হরেক প্রশ্নের সমাধান!

আজই সংগ্রহ করুন

* এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্র কিংবা সংকীর্তন প্রচার বাসগুলোতে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ৭৪১৩১৩